রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ : আমাদের শিক্ষা ও কর্তব্য

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

গত ১৩ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. মুন্সিগঞ্জ জেলার দেওভোগ থানাধীন জামি'আ রাহমানিয়ায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ প্রসঙ্গটি আলোচনা করেন। সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রসঙ্গটি সর্বাধিক আলোচিত হওয়ার দাবি রাখলেও প্রায় অনালোচিতই রয়ে গেছে। এ কারণে দিনক্ষণ হিসেবে পুরনো হওয়া সত্ত্বেও সকলের জন্য উপকারী বিবেচনায় এটি রাবেতায় ছাপা হলো। –সম্পাদক

হামদ ও সালাতের পর...

জামি'আর আসাতিযায়ে কেরাম, তালিবে ইলম ও এলাকার মুরুব্বিয়ানে কেরাম! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে ই'তিকাফের নিয়তে তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ বসার তাওফীক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এত বড় দয়ালু যে, প্রবেশের পরে বিলম্বে ই'তিকাফের নিয়ত করলেও শুরু থেকেই সওয়াব দান করেন।

উদাহরণত কোন ব্যক্তি খানা খাওয়ার শুরুতে بسم الله وعلى بركة الله পড়তে পারেনি। তারপর খানার মাঝে বা এক লোকমা বাকি থাকতে بسم الله أوله وآخره পড়ে নিল, তাকেও আল্লাহ তা'আলা খানার শুরু থেকেই বরকত দান করেন। মসজিদে ই'তিকাফের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম।

বর্তমানে মানুষের মুখে মুখে সবচেয়ে বেশী আলোচিত বিষয় হল, 'রোহিঙ্গা মুসলমান'। বিনা দোষে যাদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার মুসলমানকে গুলি করে শহীদ করা হয়েছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথা কাটা হয়েছে। মাইকিং করা হয়েছে যে, 'তিন দিনের মধ্যে এলাকা খালি করে দাও। এরপর যাকে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে।' ফলে প্রাণের ভয়ে কেউ পাহাড়ি পথে কেউ নদীপথে আমাদের দেশে হিজরত করেছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেদায়াত দান করুন।

মিয়ানমারকে বলা হয় 'মগের মুল্লুক' আর জনগণকে বলা হয় 'মগ'। ছোটকাল থেকে সকলেই একটি প্রবাদবাক্য শুনে আসছি, কোন ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশি মত যাচ্ছেতাই কাজ করলে তাকে বলা হয় 'এটা মগের মুল্লুক নাকি; যা ইচ্ছা তাই করবে?' এতদিনের শোনা কথাটা এখন বাস্তব হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মগরা তাদের মুল্লুকে যা ইচ্ছা তাই করছে। আর সারা দুনিয়াবাসী দেখে দেখে শুধু হাততালি দিচ্ছে! তাদেরকে একথা বলার কেউ নেই যে, এই লোকগুলোকে তাদের দেশ থেকে কেন বের করে দেয়া হচ্ছে, তাদের অপরাধটা কী? কাফের রাষ্ট্র তো নেই-ই এমনকি কোন মুসলিম রাষ্ট্রও নেই।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকের সূরা আলে ইমরানের ১২০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন,

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا

তোমরা যদি কোন নেয়ামত লাভ কর তাহলে কাফেরদের মুখ কালো হয়ে যায়। আর তোমাদের উপর কোন মুসীবত আসলে তারা খুশিতে ঈদ পালন করে।

অন্যত্র সূরা আলে ইমরানের ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ

তোমরা কষ্ট ভোগ করো এটাই তারা কামনা করে। তোমাদের বিপদে তারা খুশি হয়।

কাফেররা রোহিঙ্গাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ পাঠাচ্ছে– বিস্কুট, পানি, জুস, চকোলেট, কাপড়চোপড়, তাঁবুসহ বাহ্যিকভাবে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করছে; কিন্তু কেউ এ কথা বলছে না যে, এই লোকগুলোকে অন্যায়ভাবে তাদের ভিটেমাটি থেকে কেন তোমরা বের করে দিলে? এদেরকে নাগরিকত্ব দিয়ে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে নাও।

আসলে এসব অন্যায়-অত্যাচারের মূল হোতা বিশ্বের তাবৎ কাফেরগোষ্ঠি। এগুলো বড় বড় কুফরী রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিকল্পিত ও সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। আর এসব অনাচার-অত্যাচারে তাদের মুখপাত্র হল জাতিসংঘ নামক হাতির দাঁত, যা শুধুই প্রদর্শনের জন্য আর মুসলমানদেরকে বোকা বানানোর জন্য। কোন দেশে ২/৪ জন অমুসলিম নিহত হলে সঙ্গে সঙ্গে শান্তি মিশন পাঠানোর ব্যবস্থা করে; অথচ মুসলমানদের ব্যাপারে সামান্য নিন্দা জানাতেও কুণ্ঠিত হয়। কী হাস্যকর ও দ্বৈত ভূমিকা। 'মিয়ানমারের মুসলমানদের ওপর একটা পরিকল্পিত গণহত্যা চালানো হবে' বিষয়টি জাতিসংঘ আগেভাগে জানা সত্ত্বেও নীরব ভূমিকা পালন করেছিল, মৌন সমর্থন দিয়েছিল। মুসলমানদের অর্থে মোটাতাজা হয়েও দুনিয়াব্যাপী মুসলিম নিধন আর কাফেরদের সুরক্ষা দেয়া তার মূল কর্মসূচী।

মগদের গুরুমশাই গৌতমবুদ্ধ বলে গেছেন- 'জীব হত্যা মহাপাপ'; কিন্তু গুরুর অনুসারীরা এখন মুসলমানদেরকে কোন জীবই মনে করছে না। তাদের মতে মশা-মাছি-পিঁপড়া মানুষকে কামড়ালেও মারা যাবে না কিন্তু মুসলমানদেরকে বিনা দোষেও হত্যা করা যাবে! কি অদ্ভুত আচরণ এসব মুখোশধারীদের! কি নিষ্ঠুর জন্তু এ মগদস্যুরা!!

যাহোক, কাফের রাষ্ট্রগুলো তো কিছু বলছে না, বলবেও না। মুসলমানদের মৃত্যুতে তারা বরং মহাখুশি। কিন্তু সারা দুনিয়ায় ৫৬/৫৭ টি মুসলিম রাষ্ট্র আছে তারাও তো কার্যকর কোন প্রতিবাদ করছে না। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সারা দুনিয়ার মুসলমান মিলে একটা শরীর, যার মাথা ব্যথা হলে পুরো শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। চোখে ব্যথা হলে পুরো শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৮৭)

এ হাদীসের দাবী অনুযায়ী একজন মুসলমানের ব্যথায় সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের ব্যথিত হওয়া উচিত। হাজার হাজার মুসলমান ভাই ক্ষুধার যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছে, গুলিবিদ্ধ হয়ে বেঘোরে প্রাণ দিচ্ছে, মা-বোনদের ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠিত হচ্ছে; তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ তারা এখন মুহাজির আর আমরা বাংলাদেশীরা আনসার। মক্কার মুহাজিরগণ সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে ফকীর হয়ে মদীনায় আগমন করেছিলেন। কুরআনে কারীমের কয়েক জায়গায় মুহাজিরদেরকে ফকীর বলা হয়েছে। এ সমস্ত রোহিঙ্গা মুসলমান ভাইয়েরাও তাদেরই মত। এরাও তেমন কিছুই আনতে পারেনি। এখন আমাদের দায়িত্ব হল, তাদেরকে

দীনী এবং দুনিয়াবী দুই ধরনের সেবা প্রদান করা। দুনিয়াবী সেবা হল, তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। আর দীনী সেবা হল, মগের মুল্লকে মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে জীবন যাপন করছিল; শিক্ষা-দীক্ষার কোন ব্যবস্থা তাদের ছিল না; কাজেই যত দিন তারা আমাদের দেশে আছেন তাদেরকে কুরআনের তা'লীম দেয়া, শিশুদেরকে নূরানী কায়দা পড়ানো এবং নামায-কালামের প্রশিক্ষণ দেয়া। এই দুই ধরনের সেবা প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব। মদীনার আনসারগণ মক্কার মুহাজিরদের জন্যও জরুরী ভিত্তিতে এই দুই প্রকারের কুরবানী পেশ করেছিলেন।

রোহিঙ্গা মুসলিম ভাইয়েরা এই কঠিনতম বিপদের মুহূর্তে আশ্রয়স্থল হিসেবে পার্শ্ববর্তী একটি উন্মুক্ত মুসলিম দেশ পেয়েছে। সরকারকেও আল্লাহ তা'আলা শুভবুদ্ধি দান করেছেন যে, বাংলাদেশে প্রবেশে তারা শেষ পর্যন্ত বাধা দেয়নি। বরং এদের পুনর্বাসনের জন্য টেকনাফের বিশাল বিশাল এলাকা বরাদ্দ করে দিয়েছেন। উলামায়ে কেরাম সরকারের এই পদক্ষেপকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন।

টেকনাফ আনুমানিক ৫০ কিলোমিটার লম্বা এবং ৫ কিলোমিটার চওড়া একটি পাহাড়ী অঞ্চল। এখানে লোকজনের বসতি তেমন ঘন নয়। নাফ নদের কোল ঘেঁষে কিছু ঘর-বাড়ী রয়েছে। আগে এখানে বন্য হাতির অভয়ারণ্য ছিল। এখনও কিছু কিছু আছে। রোহিঙ্গা মুসলমানগণ এ জায়গাটিতে পাহাড়ের ঢাল স্তরে স্তরে কেটে ত্রিপল পলিথিন ইত্যাদি দিয়ে থাকার জায়গা বানিয়েছে।

মোটকথা, বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে এদেশে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছে। আর সারা দেশের আলেম ও তালিবে ইলমগণ তাদের খেদমতে জানপ্রাণ নিয়ে লেগে পড়েছে। অন্যদের তুলনায় আলেম ও তালিবে ইলমরাই রোহিঙ্গা মুহাজিরদের বেশী খেদমত করছে। সেই দূর-দূরান্তের এলাকা তথা দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় থেকে, বাংলাদেশের অপর প্রান্ত তেঁতুলিয়া থেকে উলামায়ে কেরাম গাড়ি ভরেভরে চিড়া-মুড়ি-গুড়সহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তাদের খেদমতে আগমন করছে। মুহাজিরদের খেদমতে শরীক হয়নি আমার ধারণামতে বাংলাদেশে এমন কোনও মাদরাসা নেই। সাধারণ জনগণ রোহিঙ্গা মুসলমান ভাইদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য বেশিরভাগ টাকা পয়সা কওমী উলামায়ে কেরামের হাতেই তুলে দিচ্ছে। উলামায়ে কেরাম আমানতদারীর সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করছেন। এভাবে তাদের দীনী এবং দুনিয়াবী সব ধরনের জরুরত পুরণে তারা সহায়তা করছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহর শোকর, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকেও ২০/৩০ জনের একটি জামাআত শুরু থেকেই তাদের খেদমতে নিয়োজিত আছে। জায়গায় জায়গায় বেড়া আর পলিথিন দিয়ে মসজিদ বানিয়ে দিচ্ছে। এসব মসজিদে মুসল্লীরা নামায পড়ে আর তাদের বাচ্চারা সূরা ক্বিরা'আত শিখে। একই ঘরে নামাযের সময় নামায হচ্ছে আর অন্য সময় মাদরাসা শিক্ষাও চলছে। আল্লাহ তা'আলা এসব মুসলমান ভাইদেরকে দেশে ফিরে স্বাভাবিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দিন।

শরীয়তের হুকুম হল, অন্যের বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। চিন্তা করুন তো, আল্লাহ না করুন, কখনও যদি আমাদের অবস্থাও রোহিঙ্গা মুসলমানদের মত হয়; কাফের বাহিনী অস্ত্র নিয়ে আমাদের দেশে আক্রমণ করে তখন আমাদের তো অন্য কোন দেশে প্রবেশেরও উপায় থাকবে না। বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত আর দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর-ভারত মহাসাগর। তখন এক আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া আমাদের বাঁচার কোনও রাস্তা নেই।

গোটা ভারতবর্ষ একসময় মুসলমানদের অধীন ছিল। বৃটিশ বেনিয়ারা লাখ লাখ মুসলমানকে শহীদ করে, রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে এই উপমহাদেশ দখল করেছিল। গিলেছিল বটে হজম করতে পারেনি; বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়েছে। তবে যাওয়ার সময় একটা কারসাজি করে গিয়েছে যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশ ভাগ হবে। যে এলাকায় মুসলমানদের ভোট বেশী পড়বে সে এলাকা মুসলমানদের থাকবে আর যে এলাকায় হিন্দুদের ভোট বেশী পড়বে সে এলাকা হিন্দুদেরকে দেয়া হবে। কী চরম ধূর্ততা ও প্রতারণা! ১৬ আনা ভারতবর্ষ কেড়ে নিল মুসলমানদের কাছ থেকে আর যাওয়ার সময় ১২ আনা দিয়ে গেল হিন্দুদের আর ৪ আনা দুইভাগ করে এক ভাগের নাম দিল পূর্বপাকিস্তান, যা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বমানচিত্রে স্থান পেয়েছে, আর অন্য ভাগের নাম দিল পশ্চিম পাকিস্তান, যা এখন পাকিস্তান নামে টিকে আছে। এই হল বৃটিশদের শয়তানীর নমুনা। পাকিস্তানীদের জুলুম, অত্যাচার, লুণ্ঠন আর মা বোনদের ইজ্জত আব্রু নষ্ট করার কারণে বাংলাদেশীরা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। একপর্যায়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পরাজিত হল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হল। বৃটিশরা বিদায় নেয়ার সময় বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান না হয়ে ভারতের অধীনে থাকলে কখনো এটা স্বাধীন করা সম্ভবপর ছিল না। ভারতে ৩০ টি প্রদেশ আছে। কোন প্রদেশই স্বাধীনতা পাচ্ছে না। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়, কাশ্মীরের মুসলমান এবং বাংলাদেশের পূর্বদিকের ভারতের অধিবাসীরা দীর্ঘ দিন যাবত স্বাধীনতা চাচ্ছে; কিন্তু আজও পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। দেশবিভাগের সময় বাংলাদেশ ভারতের অধীনে থাকলে আমাদেরও একই দশা হতো।

যাহোক, আমরা চতুর্দিক থেকে কাফেরদের দ্বারা বেষ্টিত। তিনদিকে ভারত আর একদিকে বঙ্গোপসাগর। কাফেররা আক্রমণ করলে বাঁচার শুধুমাত্র একটি পথই বাকি আছে। সেটা হল, আমাদেরকে আল্লাহর হয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তা'আলাকে আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। আল্লাহ যদি আমাদের সঙ্গী হয়ে যান তাহলে কোন কাফের বাহিনী আমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। اللہ جسکو رکھے کون اس کو چکھے আল্লাহ যাকে সুরক্ষা দেন, কার সাধ্য তার নাগাল পায়?

কিন্তু আমরা তো নামেমাত্র মুসলমান। আমাদের চেহারা-সুরত, লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ সব কিছু কাফেরদের মত। বহু মুসলমান গলায় টাই ঝুলায়, মদ পান করে, টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করে। এ ধরনের মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করার ওয়াদা করেননি। বরং সূরা বনী ইসরাঈলে এক কলিজা কাঁপানো আয়াত নাযিল করেছেন,

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا

এ আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমান নাম ধারণ করেও তোমরা যদি আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরীকা মত না চল তাহলে –শহর হোক বা গ্রাম– আমি তোমাদের এলাকায় শক্তিশালী কাফের বাহিনী পাঠিয়ে দিব। তারা তোমাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে গণহত্যা, লুণ্ঠন আর আগুন

লাগাতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা বাস্তবায়ন হয়েই থাকে। আল্লাহ তা'আলার সকল ওয়াদা খাঁটি মুমিনদের জন্য। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৫) কুরআনে পাকে সূরা রূমের ৪৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

পক্ষান্তরে মুসলমান নাম নিয়ে কাফেরদের মত কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী কাফের বাহিনী পাঠিয়ে শাস্তি দিয়ে থাকেন। কাজেই আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার জন্য দু'টি কাজ করতে হবে। প্রথমটি ব্যক্তিগত; অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহওয়ালা হওয়া, আল্লাহর হুকুম এবং নবীজীর তরীকা মত জীবন যাপন করা। দ্বিতীয়টি সামাজিক, অর্থাৎ সমাজের মধ্যে দা'ওয়াত ও তা'লীমের কাজ করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং মুসলমান ভাইদেরকে উযূ-নামাযসহ দীনের জরুরী বিষয়াদির তা'লীম দেয়া।

দুনিয়াবী হোক বা দীনী হোক প্রত্যেকটি কাজ হাসিল হওয়ার কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। উদাহরণত, ধান চাষ করা একটি দুনিয়াবী কাজ; এর জন্যও সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করতে হবে, ঘাস ইত্যাদি আগাছা থেকে ক্ষেত পরিষ্কার করতে হবে, এরপর বীজ বপন করে সেচ দিতে হবে, চারা গজানোর পর আবার আগাছা জন্ম হলে সেগুলোও সাবধানে নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। এতসব নিয়ম অনুসরণ করার পরে একটা ধান থেকে আল্লাহ তা'আলা হয়তো ৭০০ ধান দান করবেন। একটা ধান থেকে প্রথমে একটা গাছই হয়। এই গাছের চতুর্দিক থেকে আরো ছয়-সাতটা গাছ উদ্‌গত হয়। প্রত্যেকটা গাছে একটি করে শীষ আসে এবং প্রত্যেক শীষে একশত ধান থাকে। এভাবে একটি বীজধান থেকে সাতশত ধান হয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২৬১নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

(অর্থ:) যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাদের উপমা হল একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে থাকে একশত শস্যদানা।

এমনিভাবে কেউ মুফতী হতে চাইলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে উস্তাদদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী লাগাতার ১৫/১৬ বছর জবরদস্ত মেহনত করতে হবে। প্রাইমারীতে কিংবা স্কুলে ভর্তি হলে মুফতী হওয়া যাবে না। প্রাইমারীতে পুরোপুরি মারে না– 'প্রায় মারে', আর কলেজ-ভার্সিটিতে নিয়ে পুরোপুরি মারে; একবারে নাস্তিক বানিয়ে ছাড়ে।

মোটকথা, প্রত্যেক কাজের তরীকা ও নিয়ম-পদ্ধতি আছে। ঐ তরীকা বা নিয়ম লঙ্ঘন করা যায় না। নবুওয়াতের তের বছর পর নবীজী হিজরত করে মদীনায় এলেন। মদীনার লোকেরা চাষাবাদে দক্ষ ছিল আর মক্কার লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে। নবীজী দেখলেন, মদীনার লোকেরা খেজুরের ফলন ভালো হওয়ার জন্য পুরুষ গাছের ফুল নিয়ে মাদি গাছের ফুলের উপর ছিটিয়ে দেয়। আরবীতে এটাকে 'তাবীর' বলে, বাংলায় বলে পরাগায়ন। নবীজী বললেন, এমন না করলে হয় না! মদীনাবাসীরা নবীজীর কথা শোনে পরীক্ষামূলক এক বছর 'তাবীর' করল না। দেখা গেল, সে বছর খেজুরের ফলনও হয়েছে কম দানাও অপুষ্ট। অর্থাৎ অন্যান্য বছর ৫ মণ হলে এ বছর হল ২/৩ মণ। আবার আকৃতিও ছোট। বিষয়টি নবীজীকে জানানো হলে তিনি বললেন, দেখ, আমার কথাটা ছিল নিছক জাগতিক বিষয় সম্পর্কে। সেটা ওহীও না শরীয়তও না। বৈষয়িক ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে তোমাদের বেশী। তোমাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যদি 'তাবীর' করলে ফলন ভাল হয় তাহলে তাবীর করতে পারো। দেখুন এখানে সাধারণ নীতি ভঙ্গ করা হয়েছে, ফলে ফসল কম উৎপন্ন হয়েছে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৩৬৩)

বোঝাতে চাচ্ছি, দুনিয়াতে সব কিছুরই নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি আছে। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্যও চিরন্তন একটি নিয়ম আছে। কোন যামানায় এই নিয়মের লঙ্ঘন হয়নি; বর্তমানেও হবে না, ভবিষ্যতেও হবে না। সেই নিয়ম হল, কোন আল্লাহওয়ালার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক (সংশোধনমূলক) স্থাপন করা, তার সঙ্গে মহব্বত রাখা, তার মজলিসে আসা-যাওয়া করা। কুরআন-সুন্নাহয় আল্লাহওয়ালা হওয়ার এই একটিমাত্র পন্থাই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।

অনুরূপভাবে সূরা ফুরকানের ৫৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

রহমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো এমন কাউকে যে জানে।

সাইন্স আর বিজ্ঞান দিয়ে আর যা হয় হোক, আল্লাহওয়ালা কখনই হওয়া যাবে না। অন্যথায় সবচেয়ে বেশি ইউরোপ-আমেরিকার লোক ইমাম গাযালী রহ. এর মত আল্লাহওয়ালা হয়ে যেতো। অথচ বাস্তবতা হল, সারা দুনিয়ায় নীতি-নৈতিকতা ও আখলাক চরিত্রের সবচেয়ে বেশী অধঃপতন পরিলক্ষিত হয় এসব দেশে। সেখানে একটা মেয়ের সঙ্গে সংসার করা যাবে কি না তা বোঝার জন্য বিয়ের পূর্বেই তার সঙ্গে থাকা শুরু করে। দেখতে দেখতে বিয়ের আগেই বাচ্চা হয়ে যায়। এরপর বিয়ে করার দু'বছরের মধ্যেই স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। ওরা মদ পান করে, সমকামিতায় অভ্যস্ত, শুকর খায় আর কুকুর নিয়ে পড়ে থাকে। গাড়ীতে বসে থাকলেও কোলে একটা কুকুর রাখে। মনের সাধ মেটানোর জন্য আসল কুকুর না পাওয়া গেলে প্লাস্টিকের কুকুর কিনে হলেও সঙ্গে রাখে। শুকর আর কুকুর ছাড়া এদের জীবন চলে না।

মোটকথা সাইন্স আর বিজ্ঞান দিয়ে কখনো আল্লাহওয়ালা হওয়া যায় না। যত লোক এ পর্যন্ত আল্লাহওয়ালা হয়েছেন, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন, আলোকিত মানুষ হয়েছেন এবং তাদের সোহবতে গিয়ে লাখ লাখ মানুষ নিজেদের যিন্দেগী শুধরে নিয়েছেন তারা কোন না কোন আল্লাহওয়ালার হাত ধরেছিলেন; অর্থাৎ তার সঙ্গে আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক কায়েম করেছিলেন। তাদের কথা অনুযায়ী যিন্দেগী পরিচালনা করেছিলেন।

আমাদের মাযহাবের ইমাম, ইমামে আ'যম আবু হানীফা রহ. ইমাম জা'ফর ছাদেক রহ.-এর সোহবতে দুই বছর ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি- لولا السنتان لهلك النعمان অর্থাৎ যদি দু'টি বছর (ইমাম জা'ফর সাদেকের সোহবতে ধন্য) না হতো তাহলে আবু হানীফা নো'মান অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতো।

ইমাম গাযালী রহ.। অনেক বড় আলেম ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন। তাঁর কিতাব বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কাফেররা

পর্যন্ত স্বীকার করে যে, ইমাম গাযালীর মত দার্শনিক পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি। সেই তিনিও হযরত আবু আলী মাখদুমী রহ.-এর সোহবত গ্রহণ করে এত বড় আল্লাহওয়ালা ও দার্শনিক হয়েছিলেন।

শাইখ নিযামুদ্দীন রহ.। যার বানানো দরসে নেযামী অর্থাৎ নেযামী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সিলেবাস দারুল উলূম দেওবন্দসহ সমস্ত কওমী মাদরাসায় পড়ানো হয়, যে সিলেবাস পড়ে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ আলেম হয়েছে, মুফতী হয়েছে, শাইখুল হাদীস ও শাইখুত তাফসীর হয়েছে, বহু মানুষ দার্শনিক হয়েছে, আল্লাহওয়ালা হয়েছে তিনি শাইখ আব্দুর রায্যাক বাসাভী রহ.-এর হাতে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর ফুয়ূয ও বারাকাতে আল্লাহ তা'আলা হযরত নিযামুদ্দীন রহ. থেকে এত বড় খেদমত নিয়েছেন।

শাহ ইসমাইল শহীদ রহ. অনেক বড় আলেম, বুযুর্গ ও মর্দে মুজাহিদ ছিলেন। তিনি সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.– যিনি বালাকোটের ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন –তার হাতে বাই'আত হয়েছিলেন।।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা হযরতজী ইলিয়াস সাহেব রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মুরীদ ছিলেন। এই উসিলায় আল্লাহ তা'আলা হযরতজী ইলিয়াস সাহেব রহ. থেকে সারা দুনিয়াব্যাপী দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ নিচ্ছেন।

হযরত সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ. অনেক বড় মুহাক্কিক আলেম ছিলেন, যার লেখা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত থানভী রহ.-এর হাতে হাত না দিয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা উল্লেখযোগ্য কোন কাজ নেননি।

হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, কাসেম নানুতাবী, আশরাফ আলী থানভী– এঁরা ছিলেন গত শতাব্দীর সব চেয়ে বড় আলেম। এ ব্যাপারে এ সকল বুযুর্গের উক্তি হল, শুধুমাত্র ইলমের কারণে দুনিয়াতে আমাদের পরিচিতি হয়নি; হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর হাতে বাই'আতের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সারা দুনিয়ায় আলোকিত করে দিয়েছেন।

মুফতী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. বলেন, স্বপ্নে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একশত মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি একশত মাসআলার সঠিক উত্তর দিয়েছি। তখন নবীজী বললেন, তোমার মধ্যে ফাতওয়া দেয়ার যোগ্যতা রয়েছে, তুমি ফাতওয়া দিতে পার। তিনি হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর হাতে বাই'আত ছিলেন। বাহ্যিকভাবে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ. থেকে বড় আলেম ছিলেন। হযরত হাজী সাহেব রহ. ধারাবাহিকভাবে কাফিয়া পর্যন্ত পড়েছিলেন। বাকী জামাআতগুলো ব্যক্তিগতভাবে পড়েছিলেন। অথচ তাঁর কাছে বাই'আত হলেন ইলমের সাগরতুল্য মহান ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু এ সাগরও সাগর হয়নি যতক্ষণ না আরেকজন আল্লাহওয়ালার কাছে নিজেকে সোপর্দ করেছেন।

বাংলাদেশের প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব দা. বা. একজন ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ। তিনি প্রথমে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর কাছে এবং পরবর্তীতে হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.-এর কাছে নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছেন। প্রফেসর সাহেব এক যামানায় নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর সোহবতে এসে হাজার হাজার ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা দীনদার হচ্ছে, আল্লাহওয়ালা হচ্ছে। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. জীবনের শেষদিকে হযরত শাহ আবরারুল হক রহ.-কে বাংলাদেশে দা'ওয়াত দিয়ে নিয়ে এসে নিজের খানকায় রেখে ঘোষণা করে দিলেন, তোমরা যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখো তারা সকলে আমার পীর ভাই মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেবের হাতে বাই'আত হয়ে যাও। হাফেজ্জী হুযূরের ভক্তবৃন্দ তাঁর আদেশ পালন করে শাহ আবরারুল হক ছাহেবের সোহবতে গিয়ে ধন্য হলেন। অনেকে নক্ষত্র হয়ে জাতির কাণ্ডারী হলেন। যাদের মধ্যে মুফতী আব্দুর রহমান রহ. ও শাইখুল হাদীস আল্লামা মাহমূদুল হাসান দা.বা. অন্যতম।

করাচীর একজন বড় আলেম জাস্টিস মুফতী শাইখুল হাদীস মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব দা.বা.। তিনি বাই'আত ছিলেন ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর হাতে, যিনি একজন অ্যাডভোকেট ও হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার সাহেব নিজেকে মিটিয়েছিলেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর কাছে। এই মেটানোর দরুন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই পরিমাণ ইলম দান করেছিলেন, যে ইলম দ্বারা তিনি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেবের মত বড় বড় শাইখুল হাদীস সাহেবদের সমস্যার সমাধান দিতেন। এগুলো সামান্য কিছু উদাহরণ, যার সারমর্ম হল, প্রদীপ আসলে প্রদীপ থেকেই প্রজ্জ্বলিত হয়।

এসব উদাহরণ দ্বারা উদ্দেশ্য একথা বোঝানো যে, নিজে নিজে গবেষণা করে চিন্তাবিদ তো হওয়া যায়, স্কলার তো হওয়া যায়; কিন্তু আল্লাহওয়ালা হওয়া যায় না।

আল্লাহওয়ালা হওয়ার চিরন্তন নিয়ম হল, কোন হক্কানী আলেমের সোহবত গ্রহণ করা। আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য এবং আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য এর বিকল্প নেই।

মোটকথা, আল্লাহর আযাব-গযব থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে কোন আল্লাহওয়ালার সোহবতে গিয়ে নিজেকে আল্লাহওয়ালা বানাতে হবে। আর সামাজিক জীবনে চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি দীনের দা'ওয়াত ও তা'লীমের জন্য সময় বের করতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মানুষকে ঈমান-আমলের দা'ওয়াত দিতে হবে। উযূ-গোসল, আযান-ইকামত, নামায-কালামসহ সকল কাজের সুন্নাত তরীকা নিজেও শিখতে হবে এবং অন্যকেও শেখাতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলার মদদ ও নুসরত আমাদের সঙ্গে থাকবে। তখন কোন শক্তিই আর আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহওয়ালা হওয়া আর সামাজিক জীবনে দা'ওয়াত-তা'লীমের জন্য সময় বের করা– রোহিঙ্গা মুসলমানদের বর্তমান হালত থেকে মোটাদাগে এই দু'টি বিষয় আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। আর রোহিঙ্গা মুহাজিররাও যদি বিপদমুক্ত হয়ে ইজ্জতের যিন্দেগী যাপন করতে চায় তাদের জন্যও আল্লাহ তা'আলার এই একই অলঙ্ঘনীয় বিধান। দাওয়াতের মাধ্যমে তাদেরকেও কুরআনের এ বিধান জানানো বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাতুল্লাহ
শিক্ষার্থী, ইফতা ২য় বর্ষ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সমসাময়িক প্রসঙ্গ

আলেমদের প্রতি আস্থাহীনতা গোমরাহীর প্রথম সোপান

মুফতী সাঈদ আহমাদ

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আলেমগণের মর্যাদা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র ঘোষণা,

এক.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

অর্থ : আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে। (সূরা ফাতির- ২৮)

দুই.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

অর্থ : আল্লাহ যাকে চান হিকমত দান করেন। আর যে হিকমত প্রাপ্ত হল সে প্রচুর কল্যাণ পেয়ে গেল। (সূরা বাকারা- ২৪৯)

উল্লেখ্য, উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য ইলমে দীন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ঘোষণা,

এক.

فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.

অর্থ : আবেদের তুলনায় আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব এমন, যেমন তোমাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তির তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্ব। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৮৫)

দুই.

خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে কুরআন শেখে ও শেখায়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০২৭)

তিন.

إن العلماء ورثة الأنبياء.

অর্থ : আলেমগণ সকল নবীর ওয়ারিস। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৮২)

চার.

فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.

অর্থ : একজন ফকীহ শয়তানের বিপক্ষে একহাজার আবেদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২২২)

পাঁচ.

كن عالما اومتعلما اومحبا اومتبعا ولا تكن خامسا فتهلك.

অর্থ : তুমি আলেম হও অথবা তালিবে ইলম হও কিংবা আলেমকে ভালোবাসো নতুবা আলেমকে মেনে চলো; পঞ্চম হয়ো না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। (আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা লিল-বাইহাকী; হা.নং ২৮৭)

প্রিয় পাঠক! আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আরো বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। বলাবাহুল্য, এ সকল বাণী ঐ আলেম সম্পর্কে প্রযোজ্য, যে হকপন্থী ও বিশুদ্ধ ইলমের অধিকারী হবে। অসৎ আলেম ও নামকাওয়াস্তে শুধু সনদধারী আলেম সম্পর্কে কখনোই প্রযোজ্য নয়।

মনে রাখতে হবে, যে আবেদের তুলনায় আলেমকে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে সে ঐ আবেদ, যে জরুরী ইলম শিখার পর ঠিক সঠিকভাবে ইবাদত আঞ্জাম দেয়। মূর্খ ও বদদীন আবেদ মোটেও উদ্দেশ্য নয়। মূর্খ ও বদদীনের তো আলেমের সঙ্গে কোন তুলনাই চলবে না। আর ইসলাম যেহেতু সার্বজনীন ও সর্বকালীন ধর্ম কাজেই কিয়ামতের আগ পর্যন্ত ইলম থাকবে, আলেমে দীনও থাকবে। তবে সাধারণ উম্মতের মান যেমন ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে, আলেমের মানও সমানতালে কমতে থাকবে। শুধু আলেমের মান কমবে, আর সাধারণ উম্মতেরা সোনালী যুগের উম্মতের মতই থাকবে এমনটা ভাবার কোন যুক্তি নেই। উম্মতের গুণগত মান ও আলেমের গুণগত মান সর্বযুগে সমপর্যায়ের ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও একই রকম থাকবে। এর ব্যতিক্রম নেই, হবেও না। আজ অধিকাংশ লোক আলেমদেরকে পূর্ববর্তী আলেমদের ওজনে পরিমাপ করে; কিন্তু নিজেদেরকে পূর্ববর্তী উম্মতের পাল্লায় মাপে না। এটা যে খাঁটি মানের বেওকুফী, তাও তারা জানে না।

এটাও সত্য যে, সাহাবীদের সময়ে যেমন সাহাবী বেশধারী মুনাফিক লোকও ছিল, তেমনিভাবে পরবর্তী সকল যুগেই আলেমদের পাশাপাশি আলেমের লেবাসধারী ও মুখোশধারী অনেক অসৎ আলেমও থাকবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পূর্ববর্তী কোন যুগে দীনের চাকা যেমন আলেমবিহীন চলেনি; ভবিষ্যতেও কখনো ঘুরবে না। সত্যসন্ধানী লোকেরা খাঁটি আলেম খুঁজে নিবেই। ফলে সঠিক পথে চলতে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। তাদের কাছে হক্কানী আলেমের কখনো আকাল পড়বে না।

আলেমদের উদাহরণ

আলেমরা হলেন দীনের পাওয়ার হাউজ। যেহেতু দীনের ভিত্তি হল, কুরআন-সুন্নাহ; কাজেই কুরআন-সুন্নাহ'য় যারা পারদর্শী তারাই সর্বযুগে দীনের কেন্দ্রস্থল হবে– এটা একদম স্বাভাবিক। কুরআন-সুন্নাহর ইলমধারী আলেমদের তুলনায় কুরআন-সুন্নাহর ইলমে ব-কলম লোকেরা দীন বেশি বুঝবে, সুস্থ বিবেক এটা মানতে পারে না। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী চলতে চাইলে সাধারণ মানুষকে আলেমদের কাছে আসতেই হবে। এক্ষেত্রে আলেমরা হলেন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন আর সাধারণ মানুষ হল অন্ধ। অন্ধরা নিরাপদে পথ চলতে চাইলে যেমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকের সহায়তা নিতে হয়, তেমনি সাধারণ মুসলমানদের দীনের উপর চলার ইচ্ছা থাকলে সরাসরি বা কারো মাধ্যমে আলেমের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। মধ্যকার সংযোগ যতই দীর্ঘ হোক, পাওয়ার হাউজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে বাতি জ্বলবে, মোটর ঘুরবে। কিন্তু পাওয়ার হাউজের কাছাকাছি অবস্থান করেও সংযোগ-বিচ্ছিন্ন হলে যেমন বাতি জ্বলে না, অন্ধকারই বহাল থাকে, তেমনি প্রত্যেক ঈমানদারকে যে কোনভাবে কোন আলেমের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে তার অন্তরঘরে আলো জ্বলবে না; সেটা অন্ধকারই থেকে যাবে।

মোটকথা, সাধারণ উম্মত যদি সঠিক দীনের উপর থাকতে চায় তাহলে আলেমকে রাহবার বানাবে অথবা আলেমের রাহবারীতে চলে এমন ব্যক্তিকে রাহবার বানাবে। অন্যথায় এক অন্ধের পিঠে হাত রেখে আরেক অন্ধের পথ চলার মত হবে। এরা সমতল রাস্তায় কিছুক্ষণ চলতে পারলেও উঁচু-নিচু ও এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় দিশারী ও অনুসারী উভয়েই হোঁচট খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

আলেমদের আরেকটি তুলনা হয় সমুদ্রের সঙ্গে। সমুদ্র নিজেকে জীবন্ত রাখার পাশাপাশি খাল-বিল, নদী-নালাকেও জীবন্ত রাখে। অপরদিকে বিচ্ছিন্ন ও বিস্তীর্ণ স্থলভূমিকেও মেঘের আকারে পানি পৌঁছে দিয়ে সজীব রাখে। ঠিক তেমনি পৃথিবীতে আলেমগণ আছেন

বলেই দীন আছে। আলেমগণের কাছ থেকেই মানুষ দীন শেখে। কখনো আলেমের কাছে এসে শেখে, কখনো আলেমের কাছ থেকে শিখে নেয়া ব্যক্তির মাধ্যমে শেখে। যে আলেম না বা আলেমের শিষ্যও না, সে তো নিজেই রিক্তহস্ত; অন্যকে কী দিবে?

কতক অবুঝ লোক মাদরাসা-মসজিদ ও খানকায় দীনের খিদমতে রত আলেমদেরকে তুলনা করে কূপের সঙ্গে। তাদের চিন্তা-জগতে সাগরের অস্তিত্বই নেই। অন্যথায় সাগরের সঙ্গে তারা কাদেরকে তুলনা করবে?

আলেমগণের দায়িত্ব

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

(ক)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ...

অর্থ : স্মরণ করো ঐ সময়কে যখন আল্লাহ তা'আলা কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তোমরা অবশ্যই একে সুস্পষ্টাকারে বর্ণনা করবে এবং এর কোন বিষয়কে গোপন করবে না...। (সূরা আলে ইমরান- ১৮৭)

(খ)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

অর্থ : তিনিই নিরক্ষর লোকদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর কালাম পড়ে শোনান। তাদের অন্তরাত্মা পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দান করেন...। (সূরা জুমু'আ- ২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يحمل هذا العلم من خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين.

অর্থ : প্রত্যেক প্রজন্মের সৎ ও যোগ্য লোকেরা এ ইলমের ধারক হবে। এরা এ ইলম থেকে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের ষড়যন্ত্র ও মূর্খদের অপব্যাখ্যাকে প্রতিহত করবে। (আল-মাদখাল লিল-বাইহাকী)

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে নবীজীর ওয়ারিস আলেমগণের মৌলিক দায়িত্ব হল-

(এক) তারা আল্লাহ প্রদত্ত ইলম অন্যদেরকে শিক্ষা দিবে।

(দুই) জনসাধারণের ঈমান, আমল ও আখলাক ঠিক করতে চেষ্টা করবে।

(তিন) ইলমে দীনের পাহারাদারী করবে। ভণ্ড, মূর্খ ও স্বার্থান্বেষীরা যেন দীনের নামে দীনের কোন ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে চৌকান্না থাকবে। তাদের সকল অপতৎপরতাকে রুখে দিবে।

এ সকল দায়িত্ব বিবেচনা করলে বোঝা যাবে যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমদেরকে সাধারণ উম্মতের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিয়োজিত করেছেন। অর্থাৎ শরীয়ত যেন একটি বাহন। সাধারণ উম্মত সে বাহনের যাত্রী। আর আলেমগণ হলেন চালক। যারা আলেমদেরকে চালকের আসনেই স্থান দিবে আর নিজেরা যাত্রীর আসনে থাকবে তারা কোনদিন পথ হারাবে না, দুর্ঘটনার শিকার হবে না। পক্ষান্তরে যারা আলেম না হয়েও চালকের আসনে বসবে আর আলেমদেরকে যাত্রীর আসনে ঠেলে দিবে তারা পথ হারাবে, দুর্ঘটনার শিকারও হবে। সুতরাং যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইলম দান করেছেন তারা যেমন ইচ্ছা করে ড্রাইভিং সিট ছাড়বে না তেমনি যারা আলেম হননি, তারা কখনো ড্রাইভিং সিটে বসবে না। হ্যাঁ, সাধারণ জনগণ রেলওয়ের বগির কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। তথা তারা জনগণকে কোন সূত্রে জড়ো করে ইঞ্জিন তথা আলেমদের সঙ্গে জুড়ে দিবে। ফলে সে যেমন গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে, তার মাধ্যমে আরো বহু লোক গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে তার যিম্মায় অর্পিত আয়াত كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. (অর্থ : তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে মানুষের (কল্যাণের) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় কাজে বাধা দিবে। সূরা আলে ইমরান- ১১০)-এ বর্ণিত দায়িত্ব পালন করা হয়ে যাবে।

আলেমদের প্রতি সাধারণ মানুষের করণীয়

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থ : তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীলদের। (সূরা নিসা- ৫৯)

দায়িত্বশীল বলতে উলামা ও ন্যায়পরায়ণ শাসকবর্গ উদ্দেশ্য। যখন ন্যায়পরায়ণ শাসক থাকবে না, তখন এ আয়াত দ্বারা শুধু আলেমগণই উদ্দেশ্য হবে।

বর্তমানে আলেমগণের আনুগত্যকে উপেক্ষা করার জন্য কত ধরনের গোমরাহীর আশ্রয় নেয়া হয়। একশ্রেণীর লোকেরা বলে, আলেম মানে জ্ঞানী। সুতরাং যে জানে সে-ই আলেম। বেচারারা এতটুকু চিন্তা করে না যে, কিছু জ্ঞান তো আবেদেরও থাকতে হবে। এখন এটুকু জেনে আবেদ সাহেবও যদি আলেম হয়ে যান তাহলে হাজার আবেদের তুলনায় একজন আলেমের শ্রেষ্ঠত্বের কী অর্থ থাকে? তাছাড়া জ্ঞানী তো অমুসলিমও হতে পারে! তাকে কি কেউ আলেম বলবে? বস্তুত 'আলেম' কথাটি যে নিছক শব্দ নয় বরং একটি সুস্পষ্ট পরিভাষা, অন্তর-কানা না হলে তো এ ব্যাপারে কারও অস্পষ্টতার শিকার হওয়ার কথা নয়। কুরআন-হাদীসের ভাষাজ্ঞান তো দূরের কথা, সহীহ-শুদ্ধ উচ্চারণটুকুও জানে না, এমন লোকও নাকি আলেম?! এমনটাই যদি হয়, তাহলে তো আর কেউ কারো অনুসারী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ মানুষ মাত্রই তো আলেম! যেহেতু সে কিছু না কিছু জানে। জানি না, এদেরকে কে বোঝাতে সক্ষম হবে!

আরেক শ্রেণীর লোক কিছু আলেমকে যে কোন কায়দায় নিজেদের পোষ্য বানিয়ে নেয়। অতঃপর বলে, আমাদের কাছেও তো আলেম আছে; আমরা আবার অন্য আলেমদেরকে মানব কেন? অথচ পোষ্যদের দিয়ে কোনদিন পরিচালকের কাজ নেয়া যায় না। এসব পোষ্যদেরকে তো তারা বহু পূর্বেই যাত্রীর আসনে বসিয়ে দিয়েছে। যার ফলে এরা গাড়ি চালানো ভুলেই গেছে। এখন বিকৃতি, ষড়যন্ত্র ও অপব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ছাড়া বিরোধিতার কোন যোগ্যতাই এদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। বর্তমানে আলেমদের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের অনেক ভুল ধারণার জন্মদাতা এ সকল পোষ্য আলেমরাই। এরাই জনগণকে শিখিয়েছে যে, 'আলেমরা হলেন কূপের মত যেখানে গিয়ে পানি আনতে হয়। আর দাঈরা হল মেঘের ন্যায় যে সর্বত্র গিয়ে বারি বর্ষণ করে। আলেমরা কুরআন-সুন্নাহর তা'লীম দিয়ে বেতন নেয়, চাকরি করে; দীনের কাজ করে না। আলেমরা কুরআন-হাদীস বোঝে; দীনের কাজ বোঝে না। কাজেই দীনের কাজে তারা অনুসরণীয় নয়' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অথচ আলেমগণ বাস্তবে কূপ নন; বরং সকল পানির মূল উৎস– সাগর। আলেমগণ পয়সার জন্য মাদরাসা বা

মসজিদের মধ্যে জমে বসে থাকে না; বরং কুরআন-হাদীসের স্বার্থে, জনগণের বৃহৎ স্বার্থেই তারা দীনী প্রতিষ্ঠানে জমে-বসে থাকেন। আলেমদের মসজিদ-মাদরাসায় জমে-বসে থাকা তাদের দাবী অনুযায়ী যদি পয়সার জন্যই হয় তাহলে মাদরাসা-মসজিদ কেন, দোকানদারী, ব্যবসা-বাণিজ্যই তো করা যায়। আলেমরা ব্যবসা করতে চাইলে তাদের সঙ্গে কেউ কুলাতে পারবে না। তারা তো পানিতে ফুঁক দিয়ে আর কালো সুতা বিতরণ করেও বহু পয়সা কামাই করতে পারে। এর পরেও কেন এত অল্প পয়সায় মাদরাসা-মসজিদের খিদমত? তাছাড়া শুরু থেকেই তো ডাল-ভর্তা খেয়ে কষ্ট করে আলেম না হয়ে কোন রকম চেষ্টা করে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বিবিএ, এমবিএ কিছু একটা সনদ গ্রহণ করতো। পরে বড় বেতনে চাকরি করতো আর ফাঁকে ফাঁকে বিনা বেতনে দীনের খিদমত করতো? আসলে আলেম হতে হলে যে কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং মাদরাসা-মসজিদের খিদমত যে কত জটিল ও কষ্টকর, এ সম্পর্কে আলোচ্য শ্রেণীর লোকদের কোন ধারণাই নেই। তাছাড়া আলেমগণ যে কত দীনী কাজ বিনা বেতনে করেন তার সঠিক ধারণাও জনগণের কাছে নেই।

আর যে কোন পন্থায় দীনের কাজ যদি কুরআন-সুন্নাহ থেকে নিঃসৃত হয় তাহলে তার সঠিক জ্ঞান ও সঠিক পন্থা কুরআন-সুন্নাহ বিশেষজ্ঞ আলেমদেরই থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং দীনের সকল কর্মপন্থা সম্পর্কে আলেমগণই বেশি অবগত। যে দীনের কাজে আলেমগণ অনভিজ্ঞ তা কোনভাবেই দীনের কাজ নয়, ঠিক যেমন কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে কোন জিনিস দীন নয়। সুতরাং ‘আলেমগণ দীনী কাজ কম বোঝেন’ এ মন্তব্য যারা করে তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারার কাজ করে।

অনেকে আলেমদের থেকে গা বাঁচানোর জন্য আলেমগণের আপোষের ইখতিলাফ-মতবিরোধকে অজুহাত বানায়। তারা বলে, ‘আলেমদেরই তো কত দল! একদল অন্য দলকে দেখতে পারে না। একসঙ্গে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে আবার এরাই দু’দলে বিভক্ত হয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে। এক পীর আরেক পীরকে সহ্য করে না। তো আমরা কার কথা মানবো আর কাকে ছাড়বো? এরচে’ ভালো সবার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা।’

মনে রাখতে হবে, এটাও একটা শয়তানী কুমন্ত্রণা। কারণ আলেমদের মতবিরোধ সাধারণত ব্যবস্থাপনা বিষয়কেন্দ্রিক। এমন মতবিরোধ ইসলামের স্বর্ণযুগেও ছিল। সাধারণ মানুষের দীনের বিষয়ে আমেলগণের এ জাতীয় মতবিরোধের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। এ মতবিরোধ অনেকটা কোন বেকারীর দুই মালিকের মতবিরোধের মত, যার পরিণতিতে এক বেকারী দুই বেকারীতে পরিণত হয়; কিন্তু তাতে ভোক্তাদের কোন সমস্যা নেই। উভয় বেকারীর রুটি-বিস্কুট একই মানের। বরং দুই মালিকের প্রতিযোগিতার ফলে এখন তাদের পণ্যের গুণগত মান আগের চেয়েও ভালো।

বস্তুতঃ আলেমগণের মতবিরোধ যদি দীনের খাতিরেই হয় তাহলে তাতে দীনের কাজে গতি আসে, ব্যাপকতা লাভ হয় এবং মানুষের জন্য দীন পাওয়া আরো সহজ হয়। এই মতবিরোধের ব্যাপারেই বলা হয়েছে,

اختلاف العلماء رحمة.

অর্থ : আলেমগণের ইখতিলাফ জনগণের জন্য রহমত।

আপত্তিকারী শ্রেণীর লোকেরা কি লক্ষ্য করে না যে, আলেমরা ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়সমূহে ইখতিলাফ সত্ত্বেও উম্মতের মৌলিক দীনী বিষয়সমূহে সবসময় একমত। ভণ্ড নবীর বিপক্ষে, নাস্তিক-মুরতাদদের বিপক্ষে, অপসংস্কৃতি ও অপরাজনীতির বিপক্ষে যখনই প্রয়োজন হয় কালবিলম্ব না করে তারা একমঞ্চে একত্রিত হয়ে যায়; যার যার অবস্থান থেকে একই ধরনের কর্মসূচী হাতে নেয়। আলেমরা পরস্পরে পৃথক হওয়ার ফলে কোন পক্ষ জনগণকে ভুল পথে চলতে উৎসাহ প্রদান করেছে এর কি উল্লেখযোগ্য কোন দৃষ্টান্ত আছে? হ্যাঁ, যে ইখতিলাফের মূলে রয়েছে শুধুই ব্যক্তিপূজা বা দলপূজা– তা অবশ্যই ঘৃণ্য ও বর্জনীয় হবে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু ইলমে দীনকে হেফাযত করার দায়িত্ব নিজ যিম্মায় রেখেছেন সেহেতু এ ধরনের ইখতিলাফে লিপ্ত ব্যক্তিরা একসময় কালের স্রোতে বিলীন হয়ে যায়। এ নিয়ে সাধারণ জনগণের দুশ্চিন্তায় থাকার প্রয়োজন নেই। এরা মূলত ‘উলামায়ে সূ’ (অসৎ আলেম), এরা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

জনগণের আরো কিছু দায়িত্ব

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সাদিকীনদের সঙ্গে থাকো। (সূরা তাওবা- ১১৯)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي.

অর্থ : হে প্রশান্ত অন্তর। সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে নিজ প্রভুর দিকে ফিরে যাও। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও ও আমার জান্নাতে প্রবেশ করে। (সূরা ফাজর- ২৭-৩০)

প্রত্যেক যুগের আলেমগণ হলেন, সাদিকীন ও আল্লাহর নেক বান্দাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সত্যিকারের আলেমগণ নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে অধঃপতনের যে স্তরে নামতে পারবেন সাধারণ জনগণের জন্য ব্যক্তিগত মেহনত মুজাহাদা করে সেই স্তরে পৌঁছাও কঠিন হবে।

কাজেই দীনের উপর দৃঢ়ভাবে থাকার স্বার্থে ও পরকালে সহজে জান্নাত লাভের আশায় হক্কানী আলেমগণের সংস্পর্শে থাকতে হবে। ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে আলেমগণের সঙ্গে ওঠাবসার সুযোগ নিতে হবে। কোন বিষয়ে অধিকাংশ আলেম এক পক্ষে আর সাধারণ জনগণ অপর পক্ষ হলে নিঃশর্তভাবে আলেমগণের পক্ষাবলম্বন করতে হবে। বিরোধের কারণ সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য না হলেও আলেম পক্ষকে সঠিক মনে করতে হবে। অধিকাংশ আলেম যে বিষয়ে একমত সেটা ভুল হওয়ার আশঙ্কা নিতান্তই কম। পক্ষান্তরে যেদিকে জনসাধারণের সংখ্যা বেশি সেদিকে দু-চারজন আলেম থাকলেও তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

আজকাল এমন অনেক ব্যক্তিও আলেমগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে যাদের এ সম্পর্ক তাদের দীনী কোন উপকারে আসে না। এর মূল কারণ হলো, আলেমদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের অভাব। একটি মধুভর্তি বোতল থেকে আরেকটি বোতলে মধু নিতে হলে যেমন কয়েকটি বিষয়ের প্রয়োজন– (ক) বোতলটি খালি ও পরিচ্ছন্ন হওয়া, (খ) খালি বোতলটি মধুভর্তি বোতলের সান্নিধ্যে আসা, (গ) খালি বোতলটি ভরা বোতলের নিচে থাকা। অনুরূপ খোলা ও পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। সম্পর্কটা নিবিড় হতে হবে এবং বিনয়ের সাথে থাকতে হবে। খোঁজ নিয়ে

দেখুন, আলেমগণের সাথে ওঠাবসার সুযোগ পেয়েও যাদের জীবনে পরিবর্তন আসে না, তাদের মধ্যে এ উপর্যুক্ত কোন বিষয়ের ঘাটতি অবশ্যই আছে।

একদিন একটি ফার্মেসীতে ওষুধ কিনতে গেলাম। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সালাম দিয়ে মুসাফাহা করে বললেন, আপনি অমুক মসজিদের খতীব না? আমি তো আপনাকে চিনি। প্রতিউত্তরে আমি একটু হাসলাম। এরপর কোন সৌজন্য কথা ও কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই তিনি তর্কের সুরে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা! আপনারা জুমু'আর দিনের এই বাংলা বয়ান কোথায় পেলেন? শরীয়তে নির্ধারিত আছে দুই খুতবা, আপনারা দিচ্ছেন তিন খুতবা! বললাম, খুতবার পূর্বে বয়ানের বৈধতা তো শরীয়তে আছে। তিনি বললেন, আমি খুঁজে দেখেছি, কোথাও নেই; বরং এটা একটা বিদ'আত চালু করেছেন আপনারা। আমি বললাম, এ বৈধতার ব্যাপারে তো সকল আলেম একমত। এমন একটি বিষয়ও কি বিদ'আত হতে পারে? তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, সব আলেমরা কী জানে? আমরা কি পড়াশোনা করি না? আমি বললাম, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকের পক্ষে আপনার সঙ্গে তর্ক করা সম্ভব নয়।

এরপর বিলম্ব না করে সেখান থেকে সটকে পড়লাম। এবং বেশ অবাক হলাম যে, এমন লোকও আজকাল পাগলা গারদের বাইরে বসবাস করে!

বস্তুত আলেমগণ কেউ ভুলের উর্ধ্বে নন। কম-বেশি ভুল সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে তো সাধারণত ভুলের সংখ্যাই বেশি। আলেমগণের দু'-চারটা ভুলের অজুহাতে গোটা আলেম সমাজকে একহাত নেয়া মূলত চালনী কর্তৃক সুঁইয়ের একটি ছিদ্র নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। ফুকাহায়ে কেরামের মতে আলেম সমাজকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ঈমান পরিপন্থী কাজ। কারণ আলেমগণ হলেন হিদায়াতের পাইপ লাইন। তাদেরকে অবজ্ঞা করার অর্থ হলো, হিদায়াতের সূত্র থেকে ছিটকে পড়া। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط.

অর্থ : তিন ধরনের মানুষকে একমাত্র মুনাফিক ছাড়া আর কেউ অবজ্ঞা করতে পারে না। (এক) বৃদ্ধ মুসলমান, (দুই) আলেমে দীন এবং (তিন) ন্যায় পরায়ণ শাসনকর্তা। (মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী; হা.নং ২০২)

সুতরাং নিজ ঈমান রক্ষার স্বার্থে আলেম সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে হবে।

হ্যাঁ, নির্দিষ্ট কোন আলেমের সঙ্গে জমি-জমা, আত্মীয়তা বা এ জাতীয় কোন ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে ব্যক্তিগত বিরোধ হলে তার হুকুম ভিন্ন হবে। পক্ষান্তরে পাইকারিভাবে আলেমগণের প্রতি অনাস্থা নিশ্চয় অন্তর্গত কঠিন রোগের লক্ষণ। এমন রোগ নিয়ে দু'-চারজন আলেমের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলেও গোমরাহী থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, পূর্ব-সম্পর্কের কারণে দু'-চারজন আলেমকে শ্রদ্ধা করা আসলে আলেমে দীনকে শ্রদ্ধা করা নয়। আলেমকে শ্রদ্ধা করার অর্থ হলো, ইলমে দীনের কারণে আলেমকে শ্রদ্ধা করা; তার সঙ্গে পরিচয় থাক বা না থাক এবং তার সঙ্গে কোন স্বার্থের সম্পর্ক থাক বা না থাক। আলেম হিসেবে জানতে পারলেই শ্রদ্ধা করলে এবং সম্মান প্রদর্শন করলে বোঝা যাবে যে, সে আসলেই আলেমকে ভক্তি করে এবং ইলমে দীনকে ভালোবাসে। বর্তমানে এমন নিঃশর্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কিন্তু অনেকের মধ্যেই নেই। এটা সত্যিই আতঙ্কের কথা। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : নায়েবে মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া
আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

(২২ পৃষ্ঠার পর; মাদারিসে ইসলামিয়া...)

মজবুত ওস্তাদ রাখো। ছাত্র সংখ্যা চাই কম হোক। দরকার হলে তাদের থেকে ফিস নাও। বর্তমানে গরীব বলতে কেউ নাই। মানুষ মেয়েদের পড়াশোনার জন্য টাকা দিচ্ছে, কিন্তু ছেলের বেলায় আমি গরীব। গার্জিয়ানরা মুহতামিমকে জিজ্ঞেস করতে পারে না যে, আমার ছেলেকে কী পড়াচ্ছেন? কারণ মুহতামিম তার খাবার দাবারের ব্যবস্থা করছে। আর যদি পয়সা দিয়ে পড়ায় তাহলে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ থাকবে। কাজেই চাঁদা না থাকলে ছাত্রদের থেকে চাঁদা নাও।

যদি তালিবে ইলমের মধ্যে তিনটি বিষয় থাকে সে পড়াশোনা করে ফায়দা পাবে। ১. ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস না থাকতে হবে ২. পালানোর অভ্যাস না থাকতে হবে ৩. মেধা থাকতে হবে। ভর্তির পূর্বে এই তিন শর্তের প্রতি খেয়াল রাখো।

ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস থাকলে দু-একদিন সবক না শুনলে সবক মুখস্থ করা ছেড়ে দিবে। এটা হল সবকের চুরি। বর্তমানে ছাত্রদের অবস্থা হল, দৈনিক সবক না শুনলে আর খবর থাকে না। আর পালানোর অভ্যাস থাকলে দেখা যাবে তিন বছর পড়ে তারপর উধাও। আমার এক পরিচিত লোকের ছেলে হেদায়া পড়ে পলায়ন করেছে। বহু খোঁজ করে ঘরে নিয়ে আসা হল। তার আব্বা তাকে মারার জন্য লাঠি নিল। এটা দেখে সে তার আব্বাকে বলল, পরে মারেন আগে বলেন, আপনি কোন জামাআত পর্যন্ত পড়েছেন? আসলে তার আব্বাও হেদায়া পড়ে পালিয়েছিল! ছেলের এ কথা শুনে বাপ লাঠি রেখে ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিলেন।

মাওলানা আব্দুল হক সাহেব শাইখুল হিন্দের সমকালীন ছিলেন। তিনি উলূমে আকলিয়া ফনে বড় মাহের ছিলেন। এক লোক তার কাছে এসে বললেন, আমি মাকুলাত পড়ার জন্য এসেছি। মাওলানা সাহেব বললেন, পড়াবো এক শর্তে। যখন ইচ্ছা পরীক্ষা নিব। তিনি বললেন, ঠিক আছে। পরীক্ষা দিব। এক সপ্তাহ পড়ানোর পর মাওলানা সাহেব বললেন, আজ সবক হবে না। পরীক্ষা হবে। তিনি ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে, এক সপ্তাহ পরে পরীক্ষা হতে পারে। পিছনের ছয় দিনের পড়া ইয়াদ না থাকায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। মাওলানা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদায় করে দিয়েছেন। আর পড়াননি। বললেন, সারা বছর পড়ালেও তুমি কিছু ইয়াদ করবে না। পরবর্তীতে অবশ্য অনেক ধাপ পেরিয়ে কঠিন শর্তের সাথে তাকে নেয়া হয়েছিল।

সুতরাং মাদারিসে কওমিয়ার বর্তমান এই অধঃপতন থেকে মুক্তি পেতে হলে উল্লিখিত ছয়টি ফনের উপর মেহনত বাড়াতে হবে। মজবুত উস্তাদ রাখতে হবে। আরবী চাহরম পর্যন্ত মজবুত মাদরাসা তৈরী করতে হবে। সেই সাথে ছাত্র ভর্তি করার সময় শর্তাবলীর দিকে লক্ষ্য করে ভর্তি করতে হবে। নিছক প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কবুল করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : মুহাম্মাদ ইসমাঈল হাসান
শিক্ষার্থী; ইফতা (২য় বর্ষ), জামি'আ রাহমানিয়া
আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

বেদখল বাইতুল মুকাদ্দাস
কবে ভাঙবে নূরুদ্দীন-সালাহুদ্দীনের ঘুম!

মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ সাইম

পরিস্থিতি ও দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এতোটাই দ্রুত যে, আমরা নিতে পারছি না, হজম করতে পারছি না। দুনিয়ার কোথাও আজ মুসলমানের জন্য সুখবর নেই। রাবেতার গত সংখ্যায় রোহিঙ্গা মুহাজিরদের পুনর্বাসন নিয়ে লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম, অন্তত দু'-চার-ছয় মাস রোহিঙ্গাদের নিয়েই ভাবতে থাকবো, নতুন কোন দুঃসংবাদ পরিবেশনের হৃদয়বিদারী কাজটি করতে যাব না। কিন্তু হল কই? তরতাজা রোহিঙ্গাক্ষতের সঙ্গে ফিলিস্তিনের পুরনো ক্ষতটিকেও কেচে দগদগে করা হল। একটি ক্ষতের যন্ত্রণায় অভ্যস্ত না হতেই আরেকটি ক্ষত সৃষ্টি হল। নতুন যন্ত্রণাটি উচ্চমাত্রার হওয়ায় এখন পুরনোটি ভুলে যেতে হচ্ছে; নতুন যন্ত্রণায় অভ্যস্ত হওয়ার কৌশল রপ্ত করতে হচ্ছে। এভাবে প্রতিটি পরবর্তী আঘাত আগের আঘাতটিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। ফলে ধীরে ধীরে ম্লান হচ্ছে রোহিঙ্গা, আরাকান, গণহত্যা, সুচি, মগ ও মিয়ানমার শব্দগুচ্ছ। পরিবর্তে উচ্চারিত হচ্ছে– ফিলিস্তিন, বাইতুল মুকাদ্দাস, আল-আকসা, জেরুসালেম ওরফে জেরুজালেম। আমেরিকার সর্বাপেক্ষা ধূর্ত কিংবা নির্বোধতম প্রেসিডেন্ট মি. ট্রাম্প এটিকে নতুন করে আমাদের মনে-মুখে তুলে দিয়েছেন। তিনি ইসরাইল কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাসের জবরদখলের স্বীকৃতি দিয়েছেন। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে মার্কিন স্থায়ী প্রতিনিধি নিক্কি হ্যালে এই স্বীকৃতির বিরোধিতাকারীদেরকে আমেরিকার সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপকারী হিসেবে ব্যক্ত করেছেন এবং তাদেরকে দেখে নেয়ার হুমকি দিয়েছেন। দেখে-শোনে মনে হচ্ছে, জেরুসালেম বা বাইতুল মুকাদ্দাস যেন আমেরিকার পৈতৃক সম্পত্তি-বাপদাদার তালুক, তারা যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দিচ্ছে। আসলে কি তাই? নাকি এটা লুটের মালের ভাগ-বাটোয়ারা? এ ব্যাপারে ইতিহাস কী বলে? অমূল্য এ প্রশ্নটির উত্তর রাবেতার আগামী সংখ্যার জন্য তোলা রইল, ইনশাআল্লাহ। আজকে শুধু দু'-একটি বিষয়ে ইশারা করেই বিদায় নেব।

এক.

কোন ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালাতে, অপছন্দের কাউকে ঘায়েল করতে পশ্চিমাদের ডাকাতিয়া নীতি হল, ভিক্টিমকে অর্থাৎ আক্রান্তকে সবার কাছে সমস্যা ও সঙ্কট বলে প্রতিষ্ঠিত করা। উদাহরণত 'রোহিঙ্গা সঙ্কট বা রোহিঙ্গা সমস্যা', 'মিয়ানমার সঙ্কট কিংবা বৌদ্ধ সমস্যা' নয়। এটা এমন একটা অপকৌশল, যার চর্চা ও প্রচারের ক্যারিশমায় অন্যেরা তো বটেই খোদ আক্রান্তও একসময় নিজেকে সমস্যা মনে করতে শুরু করে এবং গুটিয়ে যায়। প্রথম আলোর কলামিস্ট ফারুক ওয়াসিফ লিখেছেন, 'সমস্যার নাম ইসরায়েল, পৃথিবীতে ফিলিস্তিনিরা কারও জন্য কোনো সমস্যা নয়। 'ফিলিস্তিন সমস্যা' বলা মাত্রই শান্তির পথ দূর-অস্ত হয়ে যায়। আদতে তা আসলে 'ইসরায়েল সমস্যা', 'ইহুদিবাদ সমস্যা'। ভারতীয় জাতিগুলো স্বাধীনতা চাওয়া মাত্রই ব্রিটিশরা এর নাম দিল 'ভারত সমস্যা'। ভিক্টিমকেই সমস্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার এই ভিলেইনি চাল মাত করতে না পারলে কোনো সমাধান নেই।'

দুই.

বাইতুল মুকাদ্দাসের দখলদারিত্বের স্বীকৃতির ফলে মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা পৃথিবীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তা জেনেও ট্রাম্প কেন এটি করলেন? উত্তর দিয়েছেন জনাব গোলাম মাওলা রনি তার 'জেরুসালেম ইসরাইলীদের নয়' নিবন্ধে–

'জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিলে কী কী পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তা ট্রাম্প বেশ ভালোভাবেই জানতেন। তিনি এ কথাও খুব ভালোভাবে জানেন, তার এই স্বীকৃতি শেষ অবধি বহাল থাকবে না এবং আগামী দিনে ইসরাইল রাষ্ট্রটির অস্তিত্বও থাকবে না। তারপরও তিনি নির্লজ্জভাবে ইহুদিদের পক্ষ নিয়েছেন মূলত তিনটি কারণে। প্রথমটি হলো-নিজের গদি রক্ষা। দ্বিতীয়ত-মুসলিমবিদ্বেষ এবং তৃতীয়ত- বিশ্ব রাজনীতিকে ওলটপালট করে দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের নামে মার্কিন স্বার্থ হাসিল করা। ট্রাম্প খুব ভালো করেই জানেন, প্রতি ১০০ বছর অন্তর বিভিন্ন কারণে দেশগুলোর মানচিত্র পরিবর্তন হয়ে যায়। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বহু দেশের যেমন নতুন মানচিত্র হয়েছে, তেমনি অনেক দেশ তাদের পুরনো মানচিত্র পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। এই হিসাবে আগামী ২০৪৫ সাল থেকে ২০৭৫ সাল অবধি বিশ্বে অনিবার্যভাবে যেসব মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটবে, তার মধ্যে ইসরাইলের মানচিত্রটির কবর রচনা করা হলো জেরুসালেমকে দেশটির রাজধানী ঘোষণার মাধ্যমে। অন্যদিকে, ট্রাম্প তার স্বীকৃতির মাধ্যমে উল্লিখিত কবরে ইসরাইল রাষ্ট্রটিকে লাশ বানিয়ে সমাহিত করার ব্যবস্থা পাকা করে দিলেন।' (আল্লাহ যেন তা-ই করেন।)

তিন.

কিন্তু কেন এমনটি হল? দুই মেয়াদে ১২৫০ বছর মুসলমানদের অধীনে থাকার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেন বাইতুল মুকাদ্দাসকে ফের ইয়াহুদী-নাসারাদের হাতে তুলে দিলেন? এর উত্তর দিয়েছেন তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের লেখক মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.–

'আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে ইবাদাতের জন্য দু'টি স্থানকে ইবাদাতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বাইতুল মুকাদ্দাস আর অপরটি বাইতুল্লাহ। কিন্তু আল্লাহর আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফেরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তি বাহিনীর সে ঘটনা, যা কুরআনে পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ...কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন প্রথভ্রষ্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কেবলাও ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।' (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল)

চার.

এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের করণীয় :

বিশ্বের খ্যাতিমান চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ কারজাবী বলেছেন, আল-কুদস অথবা জেরুসালেম ফিলিস্তিনিদের একার নয়, যদিও তারা এর সবচেয়ে বেশি হকদার। এটি আরবদের একার নয়, যদিও তারা এর হেফাজতের প্রথম লোক। এটি হচ্ছে সব মুসলমানের।' (নয়া দিগন্ত, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭)। সুতরাং দুনিয়ায় একেবারে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে সে মুসলিম শাসক হোক বা প্রজা, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী কিংবা দরিদ্র, পুরুষ অথবা মহিলা জেরুসালেম সবার। প্রত্যেক মুসলমানের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী আল-কুদস নিয়ে ভাবতে হবে, এর পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসতে হবে।

ফারুক ওয়াসিফ লিখেছেন, 'ইসরায়েল মাত্র দুই সময়ে হত্যা করে : শান্তিতে ও যুদ্ধে। গাধা যখন বোঝা বয়, তখনো সে গাধা, বোঝা নামিয়ে রাখলেও সে গাধাই থাকে। ইসরায়েল সুনির্দিষ্ট সীমানাহীন এক চলমান রাষ্ট্র। সুতরাং তার সেনাবাহিনীকেও চলমান থাকতে হবে! আলেকজান্ডার, হিটলার ও ইসরায়েলের বাহিনীর মিল এখানেই। নাৎসিবাদের শত্রু ছিল শান্তি, জায়নবাদেরও শত্রু শান্তি। শান্তি মানেই ইসরায়েলের সীমানা বাড়ানো বন্ধ, শেষ ফিলিস্তিনি মানুষকে তাড়ানো এবং তার জমি আত্মসাৎ বন্ধ। সুতরাং পাশ্চাত্যের হাতলহীন তরবারি ইসরায়েলকে যতক্ষণ না খাপে পোরা যাচ্ছে, যতক্ষণ না তাকে অপরের জমি থেকে সরানো যাচ্ছে, ততক্ষণ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বলে কিছু থাকতে পারে না।'

এই হাতলহীন তরবারিটি কিভাবে খাপে পোরা যায়, বা ভেঙ্গে ফেলা যায় এ ব্যাপারে কিছুদিন আগে আল্লামা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. আরবদের এক সমাবেশে বলেছেন–

'...শব্দের পরিবর্তনের দ্বারা বাস্তবতার পরিবর্তন হয় না। আমাদের খোলাখুলিভাবে স্বীকার করা উচিত, এটা আমাদের মুসলিম জাতিসত্তার বড় পরাজয়। এটা এমন পরাজয়, যার দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। আরব দেশগুলোর অপার শক্তি ও সম্ভাবনা আজ কোনো কাজে লাগছে না। মাত্র আট হাজার বর্গমাইলের একটি ছোট্ট 'রাষ্ট্র' চব্বিশ হাজার বর্গমাইলের রাষ্ট্রকে দখল করে নিয়েছে। দীর্ঘ আট শ' বছর পর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত হওয়ার বেদনা সহজে ভোলার মতো নয়। এটা এমন আঘাত, যার ব্যথা তত দিন উপশম হবে না, যত দিন না আরেকজন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জন্ম হবে।

এ পৃথিবীতে কোনো ঘটনাই কোনো কারণ ছাড়া ঘটে না। প্রতিটি ঘটনার পেছনে বাহ্যিক কিছু কারণ ও ক্রিয়ার ধারাক্রম থাকে। পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনা শিক্ষা ও উপদেশের বিশাল বহর নিয়ে আসে। জীবন সফরের বন্ধুর পথে ওই জাতিই উন্নতির ধাপগুলো অতিক্রম করতে পারে, যারা প্রতিবন্ধকতার স্থানগুলো চিহ্নিত করে তা অতিক্রম করার কৌশল খোঁজে। তাই বিপর্যয়ে শুধু হা-হুতাশ করাই আমাদের দায়িত্ব নয়; বরং ইতিহাসের এই করুণ ট্র্যাজেডি আমাদের সতত ভাবিত করে। আমাদের এ ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। ফিলিস্তিন ট্র্যাজেডি নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জীবনের একটি করুণ অধ্যায়। তবে আমরা যদি এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে পারি, তাহলে হয়তো আমাদের এ বিপর্যয় বিজয়ে রূপান্তরিত হবে। অশ্রু বিসর্জন দিয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। চৈতন্য জাগ্রত করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। এখনো সময় আছে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যালোচনা করার।

সহমর্মিতা ও সমবেদনার দাবি হচ্ছে, এই দুর্যোগময় মুহূর্তে আরব ভাইদের এই বিচ্যুতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা না করা। এমন কোনো ভুল ধরিয়ে না দেওয়া, যাতে ঘটনার দায়ভার পুরোটাই তাদের কাঁধে চেপে বসে। কিন্তু আমাদের কাছে এর চেয়ে কল্যাণময় কোনো পদ্ধতি নেই, যার আলোকে আরবীয় ভাইদের সতর্ক করা যাবে। তাই সামনের বক্তব্যের জন্য আমি আমার আরবীয় ভাইদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

কুরআন-সুন্নাহ ও বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো জাতির পার্থিব উন্নতি শুধু এ জন্যই হয় না যে, তারা আসমান থেকেই সৌভাগ্যের অধিকার নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে। পৃথিবীর সূচনা থেকে আল্লাহর রীতি হলো, দুনিয়ায় চেষ্টা-সাধনার ভিত্তিতেই প্রত্যেকের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করা হয়। মুসলমানরাও আল্লাহর এ অমোঘ নীতির ঊর্ধ্বে নয়। নিঃসন্দেহে তাদের 'শ্রেষ্ঠ জাতি'র মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে।

সন্দেহ নেই যে, মুসলিম জাতি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়। এটাও সর্বজন স্বীকৃত, দুনিয়ার বুকে কোনো ধর্ম মুসলমানদের ধর্মের সমকক্ষ নেই। কিন্তু এসব দিয়ে কখনো এই ফল বের হয় না যে, কোনো জাতি শুধু মৌখিকভাবে নিজেদের মুসলমান হওয়ার দাবি করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেই আকাশ স্পর্শ করতে পারবে, হাতের ওপর হাত রেখে বসে থাকলে সাফল্য তাদের পদ চুম্বন করবে। কুরআন ও ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুসলমানদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য দু'টি শর্ত আছে–

১. সঠিক অর্থে মুসলমান হয়ে জীবনের প্রতিটি স্তরে নিজেকে ইসলামের অনুসারী বানিয়ে নেয়া।

২. উন্নতির বাহ্যিক উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহ করা।

এ দু'টি জিনিসের মধ্যে আমাদের উন্নতি ও সাফল্যের রহস্য লুক্কায়িত। এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য দেখুন, একদিকে বলা হয়েছে, 'তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।' (সূরা আলে ইমরান- ১৩৯)। বলা হয়েছে, 'আর তোমরা দুশমনের মোকাবেলায় সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও ঘোড়ার ছাউনি তৈরি করো, যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভয় দেখাবে।' (সূরা আনফাল- ৬০)

ইসলামের ইতিহাসে যে কোন উত্থানের দিকেই আপনি নজর দেবেন, কুরআনের এ ঘোষণার সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেখানে মুসলমানরা সাচ্চা ঈমানদার হয়ে বাহ্যিক উপকরণ ও উপাদান জমা করে সাধ্যমতো সাধনা করেছে, সেখানেই তারা বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছে, যদিও তাদের জনবল ও অস্ত্র ছিল প্রতিপক্ষের তুলনায় অপ্রতুল ও সীমিত। পরাজয়ের গ্লানি মুসলমানদের ওই সময় বহন করতে হয়েছে, যখন তারা উল্লিখিত দু'টি নির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।' (আওয়ার ইসলাম২৪.কম, জুলাই ৩১, ২০১৭)

আল্লামা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা. নির্দেশিত করণীয় দু'টি একটু বিশ্লেষণ করা যাক–

প্রথম করণীয়, সঠিক অর্থে মুসলমান হয়ে জীবনের প্রতিটি স্তরে নিজেকে ইসলামের অনুসারী বানিয়ে নেয়া। এর জন্য–

প্রথম কাজ হল, কুফর, শিরক ও বিদ'আতের নাপাকি থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক-সাফ হওয়া। মূর্তির পূজা করা এবং মূর্তিকে জীবনের কোন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী মনে করার কুফরী প্রায় সব মুসলমানের কাছেই স্পষ্ট। কিন্তু কবরপূজা, মাজারপূজা, মতবাদপূজা, নেতাপূজা,

নেত্রীপূজা, দলপূজা, গোষ্ঠিপূজা এবং ব্যক্তিপূজাও যে মূর্তিপূজার মত কুফরী তা নামধারী ক'জন মুসলমান জানে ও মানে? অনুরূপভাবে আল্লাহর মুকাবিলায় কোন মানুষকে বা মানবগোষ্ঠিকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া, আল্লাহর আইনের মুকাবিলায় মানবরচিত আইনকে উপযোগী মনে করা এবং তা মানতে আল্লাহর বান্দাদেরকে বাধ্য করা, যেটা আজকে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মোড়কে মুসলিম উম্মাহর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, এটাও যে সুস্পষ্ট কুফরী ও ইরতিদাদ তা ক'জন মুসলমান জানে? সুতরাং সত্যিকার মুমিন-মুসলমান হওয়ার স্বার্থে এইসব সর্বগ্রাসী কুফর ও শিরক থেকে মুসলিম উম্মাহকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

দ্বিতীয় কাজ হল, উম্মাহর অধিকাংশ সদস্যের আমল সংশোধন করা। কুরআনে কারীম এটাকে 'ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করা বা পূর্ণাঙ্গ ইসলামে প্রবেশ করা' বলে ব্যক্ত করেছে। অধিকাংশের সংশোধিত হওয়ার বিষয়টি বলার কারণ, এই উম্মাহর সাফল্য-ব্যর্থতার বিষয়টি গুটিকয়েক ব্যক্তির ভাল-মন্দের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ গুটিকয়েক লোকের অপরাধের কারণে গোটা উম্মাহর জীবনের বিপর্যয় নেমে আসবে না এবং গুটিকয়েক লোকের নেক আমলের কারণে সবার জন্য বিজয়ের ফায়সালাও হবে না। অনুরূপভাবে দীনের আংশিক মানা আর আংশিক ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাও উম্মাহর জীবনে সাফল্যের ফায়সালা হবে না। উপরন্তু কোন কষ্টসাধ্য আমলকে এড়িয়ে যাওয়া, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, জেনে-বুঝে সে ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা দেয়া বা বিরোধিতা করা হলে তো উম্মাহর জীবনে বনী ইসরাঈলী বিপর্যয় নেমে আসবেই। মোটকথা, উম্মাহর অধিকাংশ সদস্য যদি পূর্ণাঙ্গ দীনের অনুগামী হয় তবেই সাফল্যের ফায়সালা হবে। বলাবাহুল্য উপর্যুক্ত উভয় দায়িত্ব উম্মাহর প্রতিটি সদস্যকেই পালন করতে হবে। কিন্তু উম্মাহকে এ ব্যাপারে সচেতন করা ও পথপ্রদর্শন করা বিশেষভাবে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে উম্মাহকে সঠিক পথ দেখাবেন আর উম্মাহর জনসাধারণ সে পথে চলতে থাকবে। অবশ্য উলামায়ে কেরাম অতীতেও দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়াসহ অন্যান্য জরুরী লাইনে তাদের এ সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন এবং বর্তমানেও দিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি একথাও অনস্বীকার্য যে, কুফর, শিরক ও বিদ'আতের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন ও সয়লাব যে গতিতে এবং যে পরিমাণে বেড়ে চলছে হকপন্থীদের কাজ ও কার্যক্রম সে গতিতে ও সে পরিমাণে হচ্ছে না। তাছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে পারিপার্শ্বিকতা ও হেকমতের দোহাই দিয়ে সত্যকে আংশিক প্রকাশ করা হচ্ছে। বস্তুত আশঙ্কার কারণে সত্য প্রকাশ না করার চেয়ে সত্যের ভুল উপস্থাপনা দীনের জন্য বেশি ক্ষতিকর বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় করণীয় হল, উন্নতির বাহ্যিক উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহ করা।

এর প্রমাণ হিসেবে আল্লামা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। যার সারকথা হল, সামর্থ্য অনুযায়ী কার্যকর সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ। 'সামর্থ্য' শব্দটিতে কেউ যেন বিভ্রান্তির শিকার না হয় এজন্য আল্লাহ তা'আলা এর মাত্রাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ উম্মাহকে এমন রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে যা কাফেরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে। সুতরাং যে ধরণের প্রস্তুতি কাফেরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না সেটি কাঙ্ক্ষিত প্রস্তুতি নয়। অনুরূপভাবে ধরণ সঠিক হলেও প্রস্তুতির যে পরিমাণটি যে পর্যন্ত কাফেরদেরকে সন্ত্রস্ত করতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ গণ্য হবে না। এই আয়াতের আলোকে উম্মাহর প্রতিটি ভূখণ্ডের শাসকবর্গের উচিত ছিল, শুধু নিজেদের ভূখণ্ড রক্ষা নয় বরং গোটা পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম ভূখণ্ডের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার বৃহৎ লক্ষ্যে রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সে আলোকে রণকৌশল নির্ধারণ করা।

আজ কোন মুসলিম ভূখণ্ড কাফের কর্তৃক আক্রান্ত হলে কিংবা কোন কাফের রাষ্ট্রে মুসলিম জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হলে আমরা সেটাকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে সটকে পড়ি। এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়াকে কর্তব্য মনে করি না। মনে করলেও দায়িত্বটি প্রতিবেশি মুসলিম রাষ্ট্রের বলে চালিয়ে দেই। এদিকে ওই প্রতিবেশি রাষ্ট্রটি মনে করে সেটি আক্রান্তদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, আমাদের এতে নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। মোটকথা, পাছে নির্যাতক রাষ্ট্রটি নাখোশ হয় এই আশঙ্কায় সবাই গা বাঁচিয়ে চলার নীতি অবলম্বন করি। এভাবে মজলুম রাষ্ট্রটি কিংবা নির্যাতিত জনগোষ্ঠিটি তাদের আশা-ভরসার সব জায়গা থেকে নিরাশ হয়ে আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য অভিশাপ দিতে থাকে। কেন, ওআইসি কি পারে না মুসলিম ভূখণ্ডগুলো হেফাজতের লক্ষ্যে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য নিয়ে একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে, যারা মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে যে কোন আগ্রাসীদের সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করবে? ওআইসি তাহলে আর কিসের জন্য? তাছাড়া এ ব্যাপারে শুধুই কি শাসকবর্গের অবহেলা? শাসকবর্গকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে জাতির কর্ণধার উলামায়ে কেরামের কিংবা সাধারণ জনগণেরও কি কোন দায়-দায়িত্ব নেই? ইসলামের সবচেয়ে মজলুম ফরয জিহাদের বাস্তবতা এবং সুফল শাসকগোষ্ঠি ও জনগণের কানে তুলে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে তাদের করণীয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম কি পারে না শাসকবর্গ ও জনগণকে বোঝাতে? শাসকবর্গের ভুল ধরিয়ে দেয়া এবং তাদের কাছে রাখঢাক না করে ইসলামের সত্যিকার রূপটি তুলে ধরা কি উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব নয়? বস্তুত গা বাঁচিয়ে চলা এবং মজলুম হয়ে থাকা কোন সমাধান নয়। সাহস করে হক কথা উচ্চারণের মধ্যেই প্রকৃত সফলতা নিহিত। 'হয় মন্ত্রের সাধন, নয় জীবনপাতন' এটাই হওয়া উচিত হকের ঝাণ্ডাবাহীদের প্রকৃত মন-মানসিকতা। নইলে আজকে ফিলিস্তিন গেছে, কালকে যে মক্কা-মদীনা যাবে না এই নিশ্চয়তা কে দিবে? আজকে মিয়ানমার গেছে কালকে যে বাংলাদেশ যাবে না তার কি গ্যারান্টি আছে? উম্মাহর সর্বশ্রেণীর বর্তমান মন-মানসিকতা বিচার করে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায়, সত্যি সত্যিই তেমন কিছু ঘটলে তখনো আমরা কেউ ঘুম থেকে জাগব না? আর অসময়ে জাগলেও সেই জাগায় লাভ হবে না। ঘরের খুঁটি বেশিরভাগ মজবুত হয়ে দু'একটা নড়বড়ে হলে ঝড়-ঝাপ্টা সামাল দেয়ার তবু সম্ভাবনা থাকে কিন্তু সবগুলোই যদি হয় আমড়া কাঠের উপরন্তু ঘুণে ধরা তাহলে পরিণতি কী হবে সবারই জানা। তবুও কি আমরা পরবর্তী ঝড়ের আগে ঘরের দুর্বলতা মেরামতে উঠেপড়ে লাগব না?!

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া
খতীব, বসিলা বড় মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

ইসলামী আইন : প্রসঙ্গ বাল্যবিবাহ

মাওলানা হাফিজুর রহমান

বিবাহ বিধিবদ্ধ দাম্পত্য জীবন বিনির্মাণের প্রধানতম সূত্র। এটি নারী-পুরুষের মধ্যকার সবচেয়ে প্রাচীনতম বন্ধন। এ বন্ধন সূত্রেই মানুষ আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে থাকে; সদ্যভূমিষ্ট মানবশিশুটি লাভ করে বৈধতার স্বীকৃত অধিকার। মানবীয় জীবন-ধারার সূচনাকাল থেকেই এ সূত্রটির কার্যকারিতা চিরস্বীকৃত হয়ে আসছে। আল্লাহপ্রদত্ত এ বিবাহ নীতিকে কেন্দ্র করেই এ ধরাধামে মানবীয় জীবনপ্রণালী সূচিত হয়। কালে কালে মানবীয় প্রথা-আদর্শে নানা আঙ্গিকে উত্থান পতন ঘটলেও বিবাহ ধারণাটি এখনো অক্ষুণ্ন রয়েছে বেশ শক্তিমত্তার সাথেই। তাই পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেই বিবাহ প্রক্রিয়াটিকে বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে চর্চা করা হয়।

যে পবিত্র সত্তা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বৈবাহিক আইন প্রণয়ন করেছেন। এ আইনের মূলধারাগুলো কুরআন হাদীসের ছত্রে ছত্রে বেশ পরিচ্ছন্নভাবেই বিবৃত হয়েছে। হাদীস-ফিকহের গ্রন্থগুলোতে এর প্রয়োজনীয় উপধারাগুলোও যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এরপর আর তাতে সংযোজন বিয়োজনের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। ব্যক্তিবিশেষের জন্য সময় বিবেচনায় এ জাতীয় আইনগুলো ভিন্ন আঙ্গিকেও উপস্থাপিত হতে পারে। এর জন্যও সংশ্লিষ্ট আইনে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ ও উপধারা রচিত হয়েছে।

ইসলামী আইনের কোথাও বিবাহ প্রথাটি বয়সসাপেক্ষ বিবেচনায় উপস্থাপিত হয়নি। সেখানে এর জন্য সময়-কালও বেধে দেয়া হয়নি। যে কোনো বয়সে বিবাহ চুক্তিটি হয়ে যেতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবন সূচনার জন্য সাবালকত্বসহ আবশ্যিক সক্ষমতার বিধান সেখানে আরোপিত হয়েছে। যৌনজীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগতভাবেই বয়সকেন্দ্রিক একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বয়সকেন্দ্রিক সে সাবালকত্বের সীমবদ্ধতা ছাপিয়ে নতুন কোনো সীমানা প্রাচীর নির্মাণের সুযোগ ইসলামী আইনে রাখা হয়নি। ইদানিং মানবরচিত আইনের সূত্র ধরে 'বাল্যবিবাহ' যুক্ত শব্দটির বেশ প্রচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ নিবন্ধে ইসলামী আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বাল্যবিবাহ বিষয়ে বিস্তৃত একটি আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাল্যবিবাহ পরিচিতি

বাল্য অর্থ ছেলেবেলা, বালকবয়স, ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনকাল। বাল্যবিবাহ অর্থ বাল্যকালে বা অপরিণত বয়সে বিবাহ। (*সংসদ বাংলা অভিধান*; পৃষ্ঠা ৪২৫)

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৩ (খসড়া) ২ নং ধারার (গ) য়ে বলা হয়েছে 'বাল্যবিবাহ' অর্থ সেই বিবাহ যাহাতে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের যে কোনো একজন নাবালক।

নাবালকত্বের মেয়াদ

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ (১৯২৯ সালের ১৯নং আইন) এর ২নং ধারার 'ঘ' অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'নাবালক' (Minor) বলতে পুরুষের ক্ষেত্রে একুশ বৎসরের কম এবং নারীর ক্ষেত্রে আঠার বৎসরের কম যে কোনো ব্যক্তিকে বুঝাবে।' একই কথা বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৩ (খসড়া) ২নং ধারার (খ) য়ে বলা হয়েছে।

তবে ইসলামী আইন অনুসারে, একজন বালক বা বালিকা যখনই প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে তখনই তার নাবালকত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। (Child-Marriage-Prevention-Law-2013, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন* ৪১৪)

শিশু শব্দের বিচিত্র রূপ

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৩ (খসড়া) তে বলা হয়েছে, 'শিশু' (Child) অর্থ অনুর্ধ্ব আঠার বৎসরের কম বয়সী কোন ব্যক্তি। 'শিশু বিবাহ' (Child marriage) অর্থ সেই বিবাহ যাহাতে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের যে কোন একজন শিশু। (Child-Marriage-Prevention-Law-2013)

সেভ দ্য চিলড্রেন থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশে কর্মজীবী শিশু - ম্যাথিউ এ কিং ও সহযোগী রায়ান এর নক্স* বইটিতে ১৯৯৬ সনে ব্লাঞ্চেট পরিচালিত গবেষণায় শিশুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- যে মানব সন্তানের কিছু বোঝার ক্ষমতা নেই তাকে বলা হয় শিশু।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোনো মানব সন্তানকেই শিশু বলা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি ১৮ বছরের নিচের যে কোনো বালক-বালিকাকে শিশু বলে অভিহিত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সাবালকত্ব আইনে বেশ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সাবালকত্বের বয়স শুরু হবে ১৮ বছর থেকে। শিশুর সংজ্ঞা দু'টির মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশে 'শিশু এবং অল্পবয়সী' শব্দটির আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত কিছু প্রকল্পে শিশু বয়সের নিয়ম মেনে চললেও অধিকাংশ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শিশু বয়সের সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম মানা হয় না। বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় শিশু অভিধাটি বিচিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়সকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

বাংলাদেশে প্রযোজ্য প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর সংজ্ঞা

১. চাকুরীতে নিয়োগের অনুমতি প্রসঙ্গে- (কারাখানা আইন-১৯৬৫; দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন-১৯৬৫; শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন-১৯৩৮।) বয়সসীমা ১২ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হলে শিশু হিসেবে গণ্য।

২. বিবাহের ক্ষেত্রে বয়সসীমা মেয়েদের জন্য ১৮ বছর ও ছেলেদের জন্য ২১ বছর।

৩. তামাক, সুরা বা অন্য কোন মারাত্মক ড্রাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১৬ বছর।

৪. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বশেষ বয়স ১০ বছর।

৫. সামরিক বাহিনীতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের বয়স ১৬ বছর (অভিভাবকের সম্মতিতে)।

৬. ফৌজদারী দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে ১২ বছর থেকে সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বর্তাবে এবং ফৌজদারী আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কিত খণ্ডনযোগ্য আনুমানিক বয়স সীমা ৭ থেকে ১১ বছর।

৭. গ্রেফতার, আটক বা কারারুদ্ধের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা বিষয়ে (ফৌজদারী দায়-দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত) নির্ধারিত কোন বয়স নেই।

৮. মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে ১৭ বছর; ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৭ বছর; তবে শর্ত থাকে যে বয়সের অনুমান সম্পর্কে কোন যুক্তি খণ্ডন করা হয়নি।

৯. আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যদিও কোন সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারিত নেই; তবে সাক্ষীকে অবশ্যই প্রশ্ন বোঝা এবং উত্তর দেয়ার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ও সচেতন হতে হবে।

১০. আদালতে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যমে প্রতিকার পাবার ক্ষেত্রে (অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া) বয়সসীমা ১৮ বছর।

১১. যুদ্ধক্ষেত্রে নন-কমিশন অফিসারের জন্য ৬ মাসের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর এবং কমিশন্ড অফিসারের জন্য দুই বছরের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(সূত্র : First periodic report of the Government of Bangladesh under the Convention on the Rights of the Child [Draft]; Ministry of Women and Children Affairs; Government of People's Republic of Bangladesh; Dhaka, November-2000)

এর বাইরেও বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু কিছু আইনে শিশু হিসেবে কাদেরকে অভিহিত করা যাবে, সে সম্পর্কিত বিধানের উল্লেখ রয়েছে।

- চুক্তি আইনে বলা হয়েছে যে, ১৮ বছর বয়সের কম কোন ব্যক্তি চুক্তি করতে পারে না। এই আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- নিম্নতম মজুরী আইনে ১৮ বছর পূর্ণ না হলে সে শিশু হিসেবে গণ্য হয়।
- খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের তালাক আইনে নাবালক নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুত্রের ১৬ বছর এবং কন্যার ১৩ বছরের কম হলে নাবালক বলা হয়েছে।
- খনি আইনে ১৫ বছর পূর্ণ না হলে তাকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। শিশুকে খনিতে কাজে নেয়া যায় না।
- ১৯৩৯ সালের মোটর গাড়ী আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে গাড়ী এবং ২০ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে বড় গাড়ী চালানোর অনুমতি দেয়া হয় না। (তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট)

কথা হলো শিশু শব্দটিকে নিয়ে এত টানা হেচড়া এত পানি ঘোলা করার কী স্বার্থকতা থাকতে পারে।

সংজ্ঞাগত বিপত্তি (!)

একটি প্রশ্ন, বালক নাবালক শব্দ দু'টি কি বিপরীতার্থক শব্দ? বাহ্য দৃষ্টিতে শব্দদু'টিকে বিপরীতার্থক বলেই মনে হবে। কারণ মূল শব্দ হলো, বালক। এর আদিতে না উপসর্গ যুক্ত হয়ে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে। যদিও এটা ফারসী ব্যাকরণিক নীতি; কিন্তু বাংলা ব্যাকারণেও এ নীতির সিদ্ধতা বিদ্যমান। এ নীতি অনুসারে শব্দদু'টির মূল ধাতু ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে এক ও অভিন্ন। আর তা হলো, আরবী বা-লা-গা (بلغ- যৌবনে পদার্পণ করা)। আর এ ধাতুমূল থেকে গঠিত হয়েছে কর্তাবিশেষ্য বালিগ। আরবী এ বালিগ শব্দটিকে ফারসী ব্যাকরণে আদিতে না উপসর্গ যুক্ত করে বিপরীতার্থক শব্দ তৈরি করা হয়েছে। ফারসী এবং উর্দু ভাষাতে সে বালিগ শব্দটি বালেগ নাবালেগ শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই ফারসী উর্দুর নাবালেগ বাংলায় এসে নাবালক হয়েছে। নাবালক শব্দের এ রূপান্তর প্রক্রিয়া বাংলা ব্যাকরণে স্বীকৃত। সংসদ এবং বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে এ রূপান্তর ধারাকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বালক শব্দটির ক্ষেত্রে বাংলা অভিধানবেত্তারা এ রূপান্তর ধারাকে স্বীকার করতে রাজি নন। তারা বলেন, সংস্কৃত বাল শব্দান্তে ক যুক্ত হয়ে বালক শব্দের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আমরা যদি ব্যুৎপত্তিগত প্রথম মতটি গ্রহণ করি তবে বালক নাবালকের আইন ও অভিধানগত সংজ্ঞায় বড় ধরনের অসঙ্গতি ও বিপত্তি দৃষ্টিগোচর হবে। কারণ অভিধানে বালকের অর্থ করা হয়েছে 'ষোল বৎসরের অনধিক ব্যক্তি'। অন্য দিকে আইনে নাবালকের অর্থ করা হয়েছে নারী পুরুষ ভেদে ১৮ এবং ১৯ বছরের কম বয়স্ক ব্যক্তি। অথচ প্রথম ব্যুৎপত্তির দিক থেকে বালক অর্থ যৌবনপ্রাপ্ত আর নাবালক অর্থ অপ্রাপ্ত বয়স্ক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দশ বছরের একটি ছেলে এক দিক থেকে বালক এবং নাবালকও। এটা তো বড় ধরনের অসঙ্গতি। তবে যদি আমরা বাংলা আভিধানিক ব্যুৎপত্তির দিকটি আমলে নিই তবে অসঙ্গতির পরিমাণ কমে আসবে। কারণ তখন বালক নাবালক শব্দ দু'টি সমার্থবোধক শব্দে পরিণত হবে। তবে বিপত্তি খানিকটা থেকেই যাবে। কারণ বাংলা ব্যাকরণগুলোতে বাল্য বা বালকের অর্থ করা হয়েছে 'ষোল বৎসরের অনধিক ব্যক্তি'। আর বালিকার অর্থ করা হয়েছে 'অনধিক ষোল বৎসরের নারী'। সুতরাং যদি ছেলে এবং মেয়ের বয়স ১৭ হয় তাহলে আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক বাল্যবিবাহের আওতায় পড়বে না। অথচ সংসদীয় আইনে তা সম্পূর্ণরূপে বাল্যবিবাহের আওতাভুক্ত। এমন কি যদি মেয়ের বয়স ১৮ হয় এবং ছেলের বয়স ২০ হয় কিংবা মেয়ের বয়স ১৭ এবং ছেলের বয়স ২১ হয় তখনও এ বিবাহ সংসদীয় আইনের খড়গ থেকে মুক্ত হবে না। তো এক্ষেত্রে সংসদীয় আইন আর ভাষা আইনে সংঘর্ষ বেধে যাচ্ছে। এক আইনে একটার বৈধতা দিলে অন্য আইনে সেটাকে আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা দিচ্ছে। এভাবে এক আইন দ্বারা অন্য আইনকে নিয়ন্ত্রণ করার আইনগত বৈধতা কতটুকু– এ বিষয়টিও একটি পর্যালোচনাসাপেক্ষ বিষয়।

অন্যদিকে নাবালক শব্দটির আভিধানিক এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করে নি এমন বালক। কিন্তু বাল্যবিবাহ আইনে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত এবং আভিধানিক অর্থের দিকে লক্ষ্যই করা হয়নি। সেখানে নাবালক শব্দের এমন একটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যার সাথে শব্দটির সামান্যতম সংশ্লিষ্টতা নেই। কারণ পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কোনো মেয়ে সন্তান নেই যে ১৮ বছরের পূর্বে বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করেনি। তেমনিভাবে এমন কোনো ছেলে সন্তানও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ২১ বছরের আগে যৌবনে পদার্পণ করেনি। সাধারণত মেয়েরা দশ বারো বছর বয়সে আর ছেলেরা চৌদ্দ পনের বছর বয়সে প্রাপ্তবয়সে উপনীত হয়ে যায়। শব্দটির উপরে আইনী খড়গ না চালিয়ে বছর বিবেচনায়ই আইনটি প্রণয়ন করা যেত। তাহলে শব্দগত এবং সংজ্ঞাগত এত বিপত্তির জঞ্জাল সৃষ্টি হতো না। তাছাড়া এ আইনটি করার ফলে ভাষানীতির মাঝে বড় ধরনের একটি অবাঞ্ছিত দেয়াল দাঁড়িয়ে গেল। কারণ যেসব ছেলে মেয়েগুলো এখনো বয়ঃসন্ধিকাল অতক্রম করে নি মানুষ তাদেরকে কী অভিধায় অভিহিত করবে? তাদের জন্য তো আর আলাদা কোনো শব্দই অবশিষ্ট নেই। আর বিশ বছর বয়সের আগে বাবা হওয়ার দৃষ্টান্ত এ সমাজে অনেক রয়েছে। বিশেষত বেদে পল্লিতে তো এটা নিতান্তই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তো দেখা যাচ্ছে, বাবা, মা এবং ছেলে সবাই শিশু। একটি পরিবারের সবাই শিশু। কি হাস্যকার একটি ব্যাপার!

সংসদীয় এ আইনের ফলে এখন শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন বলে আলাদা কোনো স্মৃতিময় শব্দের অস্তিত্ব থাকবে না। এখন যেটা শৈশব সেটাই যৌবন, যেটা কৈশোর সেটাই শৈশব। অথচ বাংলাদেশে ছেলেবেলা বা মেয়েবেলাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার নীতি আবহমান কাল থেকেই প্রচলিত। ৫ বছরের নিচে শৈশবকাল, ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বাল্যকাল এবং ১১ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত কৈশোরকাল। (*বাংলাপিডিয়া* ১৩/৬২)

শৈশব বললে নিষ্পাপ শিশুর মুখের একটি হাসির রেখা ফুটে উঠত। এখন তা আর ফুটে উঠবে না। এখন নিষ্পাপ শিশুর হাসি বলে কোনো শব্দের স্বার্থকতা নেই। এখন শিশুটি আর নিষ্পাপ নয় পাপীও হতে পারে। কৈশোর বললে যে দুরন্তপনার একটি স্মৃতিময় চিত্র ফুটে উঠত তাও আর তেমন সুন্দর করে ফুটে উঠবে না। কারণ দোলনার নিষ্পাপ শিশুটি যদি সেকেন্ডের ভিতরে বিশ বছরের ইয়া বড় তাগড়া যুবকে পরিণত হয়ে যেতে পারে তবে কিশোর আর পিছিয়ে থাকবে কেন। কৈশোর তো শৈশবের পরবর্তী ধাপের নাম। এভাবে শব্দ ও শব্দ শিল্পীদের উপর অবিচার করার কোনো মানে হয় না।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন বৃটিশ প্রশাসনের জগদ্দল পাথর ভারত উপমহাদেশে জেঁকে বসে তখন প্রথম দিকে তারা পূর্ব থেকে চলে আসা মুসলিম আইনের উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করে নি। কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলিম আইনের উপর বৃটিশ খড়গ নেমে আসে। মুসলিম আইনের পরিধি সংকীর্ণ হতে থাকে। এমনকি শেষ অবধি ব্যক্তিগত আইনের উপরও বৃটিশ আইনের বিষেল থাবা আঘাত হানে। ফলে বৃটিশ শাসনের অবসানকালে তিনটি ব্যক্তিগত মুসলিম আইন প্রণীত হয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ (The Child Marriage Restraint Act, 1929, Act No. XIX of 1929)। আইনটি ১ অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত হয়। আর ১৯৩০ সনের পহেলা এপ্রিল হতে বলবৎ হয়। এ আইনে ১৪ বছরের নিচের পাত্রী এবং ১৮ বছরের নিচের পাত্রের বিবাহ আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। তবে এর আগে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সাবালকত্ব আইন নামে একটি আইন পাশ করা হয়েছিল। সে আইনের ৩ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, নাবালকত্বের মেয়াদ পূর্ণ হবে ১৮ বছর বয়সে। তবে যদি কোনো নাবালকের অভিভাবক ও ওই নাবালকের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কোর্ট অফ ওয়ার্ডের ওপর ন্যস্ত থাকে তাহলে নাবালকত্বের বয়সসীমা ২১ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হবে। (*বাংলাপিডিয়া* ৯/৩৩৯, ১১/২৬৫)

বৃটিশ শাসন অবসানের সাথে সাথে তাদের আইন ব্যবস্থারও অবসান হওয়া ছিল বিবেকের একটি অপরিহার্য দাবি। কিন্তু আমাদের প্রচণ্ড আক্ষেপের সাথে প্রত্যক্ষ করতে হয় তার উল্টো চিত্র। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান সরকার একটি ল' কমিশন গঠন করে। এ কমিশনে উলামায়ে কেরামকে সদস্যভুক্ত করা হয়। এ কমিশনে যখন পারিবারিক আইনের বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয় তখন উলামায়ে কেরাম পারিবারিক সমস্যার আইনী সমাধানকল্পে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যুগোপযুগী এবং যুক্তিপূর্ণ কিছু প্রস্তাবনা পেশ করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ল' কমিশন এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। পরিবার সম্পর্কিত আইনী বিষয়গুলো এভাবেই অমীমাংসিত থেকে যায়।

এরপর পাকিস্তান সরকার ১৯৫৫ সালে মুসলিম আইন সংশোধনকল্পে (!) ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ফ্যামিলি কমিশন গঠন করে। ড. খলিফা সুজা উদ্দীনকে এ কমিশনের সভাপতি করা হয়। তার মৃত্যুর পর প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মি. আব্দুর রশীদকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। কমিশন গৃহীতব্য মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারাগুলোকে সামনে রেখে প্রস্তুতকৃত কিছু প্রশ্নপত্র সারা দেশে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে প্রচারিত এ প্রশ্নপত্রের জবাব লিখে প্রচণ্ড রকমের আপত্তি জানানো হয়। উক্ত কমিশন উলামায়ে কেরামের যুক্তিপূর্ণ জবাব এবং সমালোচনা ও আপত্তির কোনো তোয়াক্কা না করে ১৯৫৬ সনের জুন মাসে রিপোর্ট পেশ করে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইনের সুপারিশ করে। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের ধর্মভীরু মুসলিম জনতার পক্ষ থেকে প্রচণ্ড রকমের প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ ব্যাপারটিকে মুলতবী ঘোষণা করে।

কিন্তু ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সেনাপ্রধান আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক আইন জারি হওয়ার সাথে সাথে সমাহিত করা সে প্রস্তাবিত আইনকে উদ্ধার করে তা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধনের জন্য আইন কমিশনের কিছু সুপারিশ কার্যকর করার ঘোষণা প্রদান করা হয়। মিডিয়ায় চাউর হয়ে যায়, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ হতে যাচ্ছে। তখন পাকিস্তানের ১৪ জন খ্যাতিমান আলেম অনুমোদিতব্য এ আইনের উপর একটি পর্যালোচনাপত্র তৈরি করেন এবং তা গভর্নমেন্ট বরাবর পেশ করে প্রতিবাদ জানানো হয়, যেন কুরআন সুন্নাহ বিরোধী এ আইন পাশ না করা হয়। এ পর্যালোচনা প্রতিবেদনটি গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা এর প্রচারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। উপরন্তু তারা কিছু অপরিণামদর্শী আলেমের সহযোগিতায় এ আইনের স্বপক্ষে অযৌক্তিক দলীল-প্রমাণের এক বিশাল স্তুপ তৈরি করে নেয়। ফলে ১৯৬১ সালে জেনারেল আইয়ুব খান উক্ত কমিশনের রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশটি ইসলামী আইন (?) হিসেবে জারি করে দেন। যা ১৯৬১ সালের ৮ নং অধ্যাদেশ নামে পরিচিত। এ আইনটি ১৯৬১ সালের ১৫ জুলাই হতে কার্যকর করা হয়। (মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ., *জাওয়াহিরুল ফিকহ* ৪/২৩৪-৩৬, জাস্টিস মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, *হামারে আইলী মাসায়েল* ১১-১৪, *বাংলাপিডিয়া* ৩/৩৮৬, ১১/২৬২, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*; পৃষ্ঠা ৯২)

১৯৬১ সালে পাশকৃত মুসলিম পারিবারিক আইনের ১২ নম্বর ধারাটি ছিল ১৯২৯ সালের বৃটিশ আইন 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯' এরই নতুন সংস্করণ। এ ধারাটিতে ১৮ বছরের কমবয়সী ছেলে এবং ১৬ বছরে বমবয়সী মেয়ের বিবাহকে আইনত নিষিদ্ধ করা হয়। তবে বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৮৪ সালের এক সংশোধনী আইনে ২১ বছরের কমবয়সী পুরুষ এবং ১৮ বছরের কমবয়সী মেয়ের বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়। (*জাওয়াহিরুল ফিকহ* ৪/২৬৪, বা.পি. ১৩/৬৪)

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের উদ্দেশ্য :

আইনটির উদ্দেশে বলা হয়েছে, বাল্যবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এ আইনের উদ্দেশ্য, বিবাহের বৈধতা কিংবা অবৈধতা প্রশ্ন উত্থাপন নয়। ব্যক্তিগত আইনে যদি কোন বিবাহ বৈধ

বলে গণ্য অথচ অত্র আইনে প্রতিকূল হলে তা শাস্তিযোগ্য। সেখানে '*এ আইনে প্রভাবিত বিবাহের বৈধতা*' শিরোনামে বলা হয়েছে ব্যক্তিগত আইনে সম্পাদিত বিবাহ এ আইন দ্বারা প্রভাবিত হবে না। যারা এ বাল্যবিবাহ সম্পাদন করবে তারাই শাস্তি পাবে। আইনটির ৪ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেহ একুশ বৎসর বয়সোর্ধ্ব সাবালক পুরুষ অথবা আঠার বৎসর বয়সোর্ধ্ব সাবালিকা নারী কোন বাল্যবিবাহের চুক্তি করলে, সে একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা একহাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। (মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন* ৪১৪)

তবে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৩ (খসড়া) তে শাস্তির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন পুরুষ বা আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক নারী কোন শিশু বা নাবালকের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তি করিলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবে। এছাড়াও সেখানে বাল্যবিবাহ পরিচালনাকারী (কাজী) এবং এর সাথে সম্পৃক্ত পিতা-মাতা বা অভিভাবকের শাস্তি বিধানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ -এর ১২(১)(ক) ধারা অনুসারে একজন নাবালকের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত ১০১)

তবে '*বাল্যবিবাহ নিরোধ*' ২০১৪ শিরোনামের একটি খসড়া আইনে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ থেকে নামিয়ে ১৬ করার একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ উদ্যোগ-পরিকল্পনা নানা মহল থেকে তীব্রভাবে সমালোচিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি কৌশল অবলম্বন করে। আর তা হলো, মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ ই থাকবে। তবে মা-বাবা চাইলে ১৬ বছরেও বিয়ে হতে পারে। ('*সম্পাদকীয়*', *আলোকিত বাংলাদেশ*; ৮ মার্চ ২০১৫)

বৃটিশরা যে দুষ্ট চিন্তা ও ইসলাম বিদ্বেষ মাথায় নিয়ে মুসলিম পারিবারিক এ আইনটির উপর আইনী খড়গ চালিয়েছিল তার বিষবাষ্প অর্ধশত বছর পরও আমাদের এ দেশীয় মুসলিম (!) আইনবেত্তাদের কলমে উদগীরিত হচ্ছে। একজন আইনবিদ বলছেন, ১৯২৯ সালে প্রণীত এই আইনটির মাধ্যমেই ইংরেজগণ ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সংস্কারমূলক উদ্দেশ্য গ্রহণ করে। মুসলিম সমাজের ক্রমঅবনতির জন্য বাল্যবিবাহ বহুলাংশে দায়ী ছিল। হেদায়া মোতাবেক বিবাহযোগ্য হওয়ার জন্য বালকদের ক্ষেত্রে বারো বৎসর এবং বালিকার ক্ষেত্রে নয় বৎসর সাবালকত্বের বয়স ধরা হইত। ইহার ফলে মুসলিম সমাজে মারাত্মক গোলযোগ ও অপকর্ম দেখা দেয় এবং বিবাহ ইচ্ছুক পক্ষসমূহ ও তাহাদের গুরুজনেরা বাল্যবিবাহের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। সাবালকত্বের বয়স নির্ধারণ করতঃ বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া এবং বিধি ভঙ্গের জন্য দণ্ডের বিধান নিশ্চিত করিয়া বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বাল্যবিবাহের বিষময় ফল রোধ করে। (মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*; পৃষ্ঠা ৮৫)

একটি আইন প্রণয়নের পেছনে কিছু যুক্তির বেসাতি দেখাতে হয়। বৃটিশ প্রশাসন ইসলাম বিদ্বেষ মাথায় রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে হাস্যকর যুক্তিগুলো তুলে ধরেছিল সেই যুক্তিগুলোই আমাদের আইনবিদ(!)রা পরিপূর্ণ আস্থার সাথে তুলে ধরছেন। স্বকীয়তাবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানের দৈন্যদশা হলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাই অ্যাডভোকেট মহোদয়ের কলমে দৃশ্যমান হলো।

বাল্যবিবাহ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসাশাস্ত্র মতে বাল্যবিবাহের প্রকৃত সংজ্ঞা হলো, বয়ঃসন্ধিকালীন বয়সে পদার্পণের পূর্বেই বিবাহের সিঁড়িতে আরোহণ করা। সুতরাং ১৮ বছরের পূর্বকালীন বিবাহকে বাল্যবিবাহ নামে অভিহিত করা বৈজ্ঞানিক এবং শরয়ী নীতিমালা অনুসারে যথার্থ নয়। বিবাহের বিষয়টি বস্তুত সাবালকত্বের সাথে সম্পৃক্ত। সাবালকত্ব এমন একটি আবহ যেখানে মানুষ তার নাবালকত্বের পর্যায় পেরিয়ে সাবালকত্বের বয়সে পদার্পণ করে। আর এ সময়টায় মানুষের মাঝে ফিজিয়োলোজিক্যাল (শরীরবৃত্তিক) এবং সাইকোলজিক্যাল (মনোবৃত্তিক) পরিবর্তন দেখা দেয়। আর সাবালকত্বের বয়স আন্তর্জাতিকভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৯ থেকে ১৬ বছরের মাঝে ওঠানামা করে। (ড. হুসামুদ্দীন আফফানা, আয্যিওয়াজুল মুবকির ১/৪) ইসলামের দৃষ্টিতে বাল্যবিবাহের দু'টি অর্থ লক্ষগোচর হয়। (১) সংকীর্ণ অর্থ। অর্থাৎ বালক-বালিকা প্রজননক্ষমতা অর্জনের বয়সে কিংবা বয়ঃসন্ধিকাল বয়সে উপনীত হওয়ার পর থেকে বৈবাহিক বয়সের সূচনা হবে। এটি মূলত সাবালকত্ব ও নাবালকত্বের স্বভাবজাত মানদণ্ড। ইসলাম প্রকৃত নাবালকত্বের সীমারেখার উপর কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপ করেনি। একজন বালক কিংবা বালিকা যখন প্রজননক্ষমতা অর্জন করবে তখন থেকেই ইসলাম তার উপর সাবালকত্বের যাবতীয় বিধান আরোপ করবে। (২) মুক্ত অর্থ। অর্থাৎ সূচনা বয়স থেকেই নবজাতকের বৈবাহিক বয়সের ধারা সূচিত হবে। তবে ইসলামী শরীয়া আইনে অপরিপক্ক এবং অনুপযোগী বয়সে যৌন জীবন বিধিসম্মত করা হয়নি।

ইমাম ইবনে শুবরুমা, আবু বাকার আসাম্ম এবং উসমান বাত্তী রাহ. প্রমুখের অভিমত হলো, প্রজননক্ষমতা অর্জন তথা প্রাপ্তবয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে বালক-বালিকার বিবাহ বিধিসম্মত নয়। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবেত্তাগণ এ অভিমতটিকে বিচ্ছিন্ন, অপ্রণিধানযোগ্য এবং সর্বসম্মত অভিমত পরিপন্থী মত বলে অভিহিত করেছেন। বিচ্ছিন্ন এ আইনী অভিমতটিকে কেন্দ্র করে আরব রাষ্ট্র সিরিয়ায় বিবাহ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। (ড. ওয়াহবাহ যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ* ৭/১৮৩-৮৮)। সর্বসম্মত না হলেও এ আইনী অভিমতটির একটি ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি সর্বসাকুল্যে অনুমাননির্ভর এবং সম্ভাব্য সমস্যা রোধকল্পে প্রণীত। প্রাকৃতিক বিধানের সাথে এর কোনোই সাযুজ্য রাখা হয়নি।

বাল্যবিবাহ বিধানের দালিলিক পর্যালোচনা

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য, তোমাদের যে সকল স্ত্রীর আর ঋতুমতী হবার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো রজঃস্বলা হয়নি তাদেরও (ইদ্দতকাল হবে তিন মাস)। ('*সূরা তালাক*'- ৪)

কুরআনিক ভাষ্যটিতে ঐসব কিশোরীদের ইদ্দতের কথা আলোচিত হয়েছে যারা এখনো রজঃস্বলা বয়সে উপনীত হয়নি। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা, ইদ্দত বিবাহোত্তর ডিভোর্স কিংবা স্বামী মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। এতে

সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, কুরআনিক আইনমতে বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বেকার বিবাহ বিধিসম্মত। অথচ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে নিছক প্রজনন ক্ষমতা অর্জনের পূবকালীন বিবাহই নয়; বরং প্রাপ্তবয়সে উপনীত হওয়ার চার পাঁচ বছরের পরবর্তী বিবাহকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদীসের ভাষ্য, (১) আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার যখন ছয় বছর বয়স হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নেন। আর আমার যখন নয় বছর বয়স হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে বাসর যাপন করেন। (*সহীহ বুখারী*; হা.নং ৫১৩৪, *সহীহ মুসলিম*; হা.নং ৩৫৪৫)

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদরের কন্যা ফাতেমা রাযি. কে আলী রাযি. এর সাথে অল্প বয়সে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন।

(৩) উমর রাযি. আলী রাযি. এর অল্পবয়সী মেয়ে উম্মে কুলসূম রাযি. এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

(৪) যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাযি. এর কন্যা যখন প্রাপ্তবয়সে উপনীত হন তখনই কুদামা ইবনে মাযউন রাযি. তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। (আবু হুসাম তারফাবী, আল-উনফ যিদ্দাল মারআহ ১/৪৯)

(৫) ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামা রাযি. এর অল্পবয়স্ক ছেলে সালামার সাথে হামযা রাযি. এর ছোট্ট মেয়েকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন। (*আহকামুল কুরআন লিলজাসসাস* ২/৩৪৪, *মাকালাতুন ফিত তাশাইউ* ৪৮/৩৬, *আলমাবসূত লিস সারাখসী* ৪/২১২)

এছাড়াও বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে সাহাবা তাবিয়ীদের আরো অসংখ্য উক্তি ও কর্মপন্থা– হাদীস, ফিকহ ও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

ইসলামী শরীয়ার সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, অল্পবয়সী শিশু-কিশোরদের বিবাহ বিধিসম্মত। ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. সূরা নিসার ৩ নম্বর আয়াতের অধীনে (আর যদি তোমরা ভয় করো যে, পিতৃহীন মেয়েদের অধিকার তোমরা যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে না তবে সে সব মেয়েদের মধ্য হতে তোমাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা বিদ্যমান।) বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, পিতার জন্য তার ছোট্ট মেয়েকে বিবাহ প্রদান করা বিধিসম্মত। কারণ এ আয়াত দ্বারা সব রকমের অভিভাবকদের জন্য তাদের অধীনস্ত বালিকাকে বিবাহ দেয়া বিধিত হওয়া প্রমাণিত। তো পিতা নিকটস্থ অভিভাবক হিসেবে এ অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় বেশি অগ্রগণ্য হবে। উপরন্তু বাল্যবিবাহ বৈধতার ব্যাপারে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কোনো ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞের ব্যতিক্রম অভিমত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। (*আহকামুল কুরআন লিলজাসসাস* ২/৩৪৬)

ইসলামী বিবাহ আইনের তাৎপর্য

ইসলাম কেন বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে এতটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেছে– এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরবো যাতে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের সামাজিক বিপত্তি ও অসঙ্গতিগুলো পরিষ্কার ফুটে উঠে।

১. একব্যক্তির প্রাপ্তবয়সী একটি ছেলে বা মেয়ে রয়েছে। উন্মাতাল যৌনতা ও অশ্লীলতার সয়লাবে তার সন্তানের চারিত্রিক অবক্ষয় চরম আকার ধারন করেছে। সে দেখছে, যদি তার সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে তার সন্তানকে চরম অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। এদিকে উপযুক্ত সম্বন্ধও হাতের নাগালে রয়েছে। তার এ দুঃসময়ে আইন তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বলবে, এ চরম অবক্ষয়ের মুহূর্তেও তুমি তোমার সন্তানকে ১৮ বা ২১ বছর আগে বিবাহ করাতে পারবে না। আইনী খড়গের কারণে তার সন্তানের অধঃপতন স্বচক্ষে দেখা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকবে না। কারণ বিবাহ ছাড়া এ ব্যধির কোনোই প্রতিষেধক নেই।

২. রোগবিছানায় শায়িত অশীতিপর বৃদ্ধ বাবার একটিমাত্র পনের বছর বয়সী কন্যা। তার ভিটায় বাতি জ্বালাবার আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। জীবনের শেষ বেলায় এসে সে চাচ্ছে, তার আদরের কন্যাটিকে একজন চরিত্রবান ভদ্র ছেলের হাতে তুলে দিয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। কিন্তু আইনী বাধ্যবাধকতার কারণে তার কন্যাকে অসহায় অবস্থায় রেখে দুঃখাক্রান্ত মন নিয়ে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আর তার আদরের মেয়েটি তার মৃত্যুর পর স্বার্থান্বেষী মহলের শিকার হয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদবে।

৩. একজন বিধবা নারীর একটিমাত্র প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা রয়েছে। আর্থিক অনটনের কারণে নিজের জন্য দু'মুঠো আহার যোগাড় করা, নিজের মান-সম্মান রক্ষা করা তার জন্য একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে তার মেয়েকে নিজের কাছে রাখা তো সীমাহীন কষ্টের ব্যাপার। সাথে সাথে এ আশঙ্কাও রয়েছে, দ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা না করলে তার আদরের মেয়েটি অসভ্য মানুষের লালসার শিকার হবে। বিধবার এমন দুঃসময়ে আইন বলবে, নাবালকত্বের মেয়াদ শেষ না হলে তুমি তোমার মেয়েকে বিবাহ দিতে পারবে না। আইনী সীমাবদ্ধতার কারণেই অস্বচ্ছল আশ্রয়হীন একটি পরিবারে নেমে আসবে দুর্যোগের কালো মেঘের পর কালবৈশাখী ঝড়।

৪. বিবাহের ক্ষেত্রে এ আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের সমাজের চারিত্রিক অবক্ষয় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যিনা-ব্যাভিচার, অশ্লীলতা ও যৌনতার প্রাদুর্ভাব ঘটবে। যা রাষ্ট্রের জন্য চূড়ান্ত পরিণতি ডেকে আনবে। কারণ উঠতি বয়সের যুবক যুবতীরা বিবাহের অনুমতি না পেয়ে তাদের জৈবিক চাহিদা নিবারণ করার লক্ষ্যে অবাধ যৌনাচারের নিষিদ্ধ পথ মাড়াতে বাধ্য হবে।

৫. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের কার্যকারিতাকে ফলপ্রসূ করার জন্যে জন্মনিবন্ধন আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে। ফলে এ বিষয়টি গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য সীমাহীন মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বিবাহের ক্ষেত্রে মানুষ হয়তো মিথ্যা সাক্ষ্য আনতে বাধ্য হচ্ছে নতুবা সন্তানের বয়সকে বিবাহযোগ্য করার জন্য অবিধানিক কোনো পন্থা গ্রহণ করছে। সমাজে এগুলো নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। (জাস্টিস মুফতী তাকী উসমানী, *হামারে আয়েলী মাসায়েল* (ঈষৎ সংক্ষেপিত, পরিবর্তিত পরিবর্ধিত ১৫৭) **(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)**

লেখক : আমীনুত তা'লীম, মা'হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মাদারিসে ইসলামিয়া : মৌলিক উদ্দেশ্য ও পর্যালোচনা

মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী

দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসীন ও শাইখুল হাদীস মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. গত ২৬ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আগমন করেন। দু'দিনের এ ব্যক্তিগত সফরের শেষ দিন খিলক্ষেতস্থ 'মাসনা মাদরাসা-ঢাকা'র উদ্বোধন উপলক্ষে এক দু'আ মজলিসের আয়োজন করা হয়। সেখানে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে মূল্যবান এ বয়ানটি পেশ করেন।

ভূমিকা

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, আযীয তলাবা ও মুসলমান ভাইয়েরা! ঢাকা শহর মাদরাসার শহর। এ শহরে অগণিত মাদরাসা রয়েছে। এ রকম একটি শহরে আজ আমরা একটি মাদারাসা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। সে জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। অনেক দোস্ত-আহবাব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও হিতাকাঙ্ক্ষীর দান-অনুদানে জমির ব্যবস্থা হয়েছে এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে একটি নতুন মাদরাসার বীজ বপন হতে যাচ্ছে। মাদরাসার এ শহরে এটি একটি চমৎকার সংযোজন।

ভাইয়েরা আমার! ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করতে হলে বাজার এলাকায় দোকান খুলতে হয়। বাজার এলাকায় দোকান বেশি চলে। যেখানে বাজার নেই, মার্কেট নেই সেখানে দোকান দিলে তেমন চলে না। তেমনি পুরো এলাকায় বা শহরে যদি একটি মাদরাসাও না থাকে তাহলে ঐ এলাকায় মাদরাসা চালানো খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। মনে পড়ে, রাজস্থানে আমরা হযরত মুফতী জামালুদ্দীন সাহেবের যামানায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। দাওরা পর্যন্ত ছিল সে মাদরাসা। কিন্তু মুফতী সাহেবের ইন্তিকালের পর ঐ মাদরাসা নাযেরা-হেফযখানায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আসলে এ ধরনের মাদরাসা টিকিয়ে রাখা সহজ ব্যাপার নয়।

পক্ষান্তরে মাদরাসাবহুল এলাকায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলে খুব সহজেই পরিচালনা করা যায়। দেওবন্দ এলাকার দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা বিষয়টা সহজে বুঝতে পারব। সে এলাকায় মাদরাসার সংখ্যা অনেক। বলতে গেলে সেখানকার প্রতিটি ইটের নীচেই যেন একেকটি মাদরাসা আছে। যে সকল ছাত্র দারুল উলূমে ভর্তির সুযোগ পায় না, তারা এ সব মাদরাসায় ভর্তি হয়। এ বছর দারুল উলূম দেওবন্দে সাড়ে চার হাজার ছাত্র মেশকাতের পরীক্ষা দিয়েছে। তার মধ্যে চৌদ্দশ' ছাত্রকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে। বাকিরা শুরুতেই বাদ পড়েছে। কেবল এই চৌদ্দশ' ছাত্রই পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে যারা সকল কিতাবে পাশ করেছে, কেবল তারাই দারুল উলূমে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

কিন্তু এই চৌদ্দশ'র বাইরে যারা ছিল, তারাও দেওবন্দেরই কোন না কোন দারুল উলূমে দাওরা পড়ছে। যেহেতু দেওবন্দ এলাকাটি মাদরাসাবহুল তাই সব মাদরাসাতেই প্রচুর ছাত্র জমা হয়ে যায়। এটা একটা সহজাত বিষয়। মাদরাসার শহর ঢাকার অবস্থায়ও তেমন। এখানে অনেক আগে থেকেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছে। বাড়তে বাড়তে এখন এখানে অগণিত মাদরাসা। সে ধারারই আরেকটি মাদরাসার ভিত্তি আজ আমরা স্থাপন করতে যাচ্ছি। আশা করি এ মাদরাসাও কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ বয়ে আনবে, ইনশাআল্লাহ।

মাদারিসে ইসলামিয়ার মৌলিক নেসাবে তা'লীম

মাদরাসাগুলো ছয়টি ফন (শাস্ত্র/বিষয়) পড়ানোর জন্য কায়েম করা হয়েছে। এই ছয়টি ফন বা শাস্ত্র হাসিল করাই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। যদি তালিবে ইলম এই ছয় ফনে 'দারক' অর্থাৎ মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে ফেলে তাহলে মাদরাসাও কামিয়াব, তালিবে ইলমও কামিয়াব। আমি 'দারক' শব্দ ব্যবহার করেছি। 'মাহারাত' বলিনি, কারণ মাহারাত বা দক্ষতা তো কোন ফনের পেছনে সারা জীবন মেহনত করলে অর্জন হতে পারে। ফনগুলো হলো,

১. কুরআনে কারীম। (তাফসীর নয়)।

২. হাদীস শরীফ। (হাদীসের শরাহ তথা ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয়)।

৩. ফিকহে ইসলামী, যেটা কুরআন ও হাদীসের সারাংশ।

এ তিনটির উসূল অর্থাৎ মূলনীতি। যথা :

৪. উলূমুল কুরআন।

৫. উলূমুল হাদীস।

৬. উসূলে ফিকহ।

এই ছয় ফন অর্জন করার জন্য কিছু সহায়ক ইলমের প্রয়োজন পড়ে। এটা আবার দু' ধরনের।

(ক) যেসব সহযোগী ইলম মৌলিক ফন শেখার পূর্বেই অর্জন করা জরুরী। এই ইলমগুলো অর্জনের পূর্বে ফনের শিক্ষা শুরু করাই সম্ভব নয়।

(খ) যেসব সহযোগী ইলম শিক্ষাজীবন শেষ করার পূর্বেই অর্জন করা জরুরী। কর্মক্ষেত্রে এগুলোর প্রয়োজন পড়বে।

মৌলিক ফন শেখার পূর্বে যে সকল ইলম অর্জন করতে হবে তার মধ্যে সবার প্রথমে হল উর্দূ ভাষা শেখা। এই ভাষা শিক্ষা না করলে ইলমের মধ্যে পূর্ণতা আসবে না। কারণ উলূমে ইসলামিয়ার এক বিশাল ভাণ্ডার আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের কিতাবে রয়েছে। যেগুলো অধিকাংশ উর্দূ ভাষায়। তাই প্রথমে উর্দূ শিখে নিতে হবে। উর্দূতে কয়েকটি জিনিষ শেখা জরুরী। ১. লেখনী ঠিক করা। ২. উচ্চারণ শুদ্ধ করা। ৩. ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

যদি আকাবিরদের কিতাবগুলো না পড়া হয় তাহলে ইলমের মধ্যে পূর্ণতা আসবে না। আমি তালিবে ইলমদের উর্দূ সহীহ না হওয়া পর্যন্ত ফার্সি ভাষা শিক্ষা দিই না। আর উর্দূর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জোর দিই লেখা ঠিক হওয়ার প্রতি। কেননা তারা উর্দূভাষী। তাদের উচ্চারণ ইত্যাদির প্রতি জোর দেয়ার প্রয়োজন হয় না, তাই লেখার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

মৌলভী ইসমাইলের উর্দূ কিতাব থেকে এক পৃষ্ঠা লেখাই, তারপর দেখি এমলায় ভুল হয়েছে কি না। ভুলগুলো একশ' বার করে লেখাই। কেউ যদি একশ' বার কোন শব্দ মশক করে, জীবনে আর কখনও ঐ শব্দ লিখতে ভুল করবে না।

আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে যখন আমি দেওবন্দ আসি তখন (বারিধারার) নূর হুসাইন সাহেবরা দাওরা ফারেগ হয়ে ফুনূনাত পড়ছিলেন। তারা তেরজন তালিবে ইলম ছিল অত্যন্ত মেধাবী। ঐ

তেরজন তালিবে ইলমকে আমি দারুল উলূম দেওবন্দের মসজিদের চত্বরে আসরের পরে কাসিম নানূতবীর উর্দূ কিতাব 'তাকরীরে দিল পাযীর' ও 'তাওসীকুল কালাম' ইত্যাদি পড়িয়েছি। এই তেরজন ছিল তখনকার ছাত্র যখন বাংলাদেশ ভাগ হয় নাই। বাংলাদেশ তখন ছিলই না। তখন বাংলাদেশের ছাত্ররা দেওবন্দে তেমন আসত না। দু' একজন আসত এবং তারা খুব সুন্দর উর্দূ জানত। যখন থেকে বাংলাদেশ হল, উর্দূভাষা আপনাদের মুখোমুখি হল। এখন বাংলাদেশের যে সকল তালিবে ইলম দেওবন্দে আসে তারা কেউ কেউ এরকম বলে, 'ম্যায় উর্দূ জানতী হ্যা'!! আমি বলি, 'হাঁ, বহুত আচ্ছা জানতী হ্যা'। বাংলাদেশের যারা এখন আকাবির আছেন, তাদের উর্দূ আর তোমাদের উর্দূর মধ্যে আসমান যমীনের পার্থক্য।

কেউ কেউ মনে করে উর্দূ বিহারীদের ভাষা, পাকিস্তানীদের ভাষা। ভায়েরা আমার, এটা পাকিস্তানীদেরও ভাষা নয় এটা বিহারীদেরও ভাষা নয়। এটা তো দীনের ভাষা, মসুলমানদের ভাষা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মুসলমান এই ভাষা বুঝে এবং বলে। আমি ব্রিটেন যাই, আমেরিকা যাই, কানাডা যাই, সেখানে ঢাকা ও সিলেটের যে সকল লোকজন আছেন তাদের তরজমার প্রয়োজন হয় না। উর্দূ তারা বুঝে। আর এদেশের কেউ বুঝে না।

বিষয়টা বুঝার জন্য একটা উদহারণ দিই। এদেশের কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে যারা ইউরোপ আমেরিকায় যায়, তারা চমৎকার ইংরেজী শিখে সেখানে যায়। কারণ ভাল করে ইংরেজী না শিখে ওখানে গিয়ে কোন লাভ হবে না। তাহলে এখান থেকে যারা দেওবন্দ যাও তারা উর্দূ ভাল করে শিখে যাও না কেন? দারুল উলূমে এসে কেউ যদি আকবিরদের উলূম শিখতে চায়, তাকে আকাবিরদের ভাষা ভাল করে আয়ত্ব করতে হবে। তা না হলে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়।

সে জন্যই আমরা প্রথমে উর্দূ সহীহ করি। তারপর ফার্সি শুরু করি। ফার্সির প্রয়োজন কী? আসলে উর্দূর মেরুদণ্ড হল ফার্সি। যখন ঔষধি হালুয়া তৈরী করা হয় তখন প্রথমে পানি আর চিনি মিশিয়ে চাটনী বানানো হয়। তারপর যেসব ঔষধ মেশানো দরকার মেশায়। ফলে সেটা ঔষধি হালুয়ায় রুপান্তর হয়।

সুতরাং পানি আর চিনি হলো হালুয়ার কেওয়াম বা মেরুদণ্ড। আর উর্দূর মেরুদণ্ড হলো ফার্সি আর আরবী। ইন্ডিয়ায় সব হিন্দুই উর্দূ বলে। কিন্তু দাবি করে, আমরা হিন্দি বলি। কারণ তাদের উর্দূর মেরুদণ্ড হল সংস্কৃত। আরবী বা ফার্সি নয়। কিন্তু মুসলমানদের উর্দূর উৎস হল আরবী ফার্সি। কাজেই ফার্সি ভাষাও শিখতে হবে যাতে উর্দূ মজবুত হয়। যখন ফার্সি অনর্গল পড়তে পারে তখন আরবী জামাআতে ভর্তি করাই।

ইস্তেদাদ তৈরীর জামাআত

ইস্তেদাদ অর্জনের আসল সময় হল আরবী জামাতে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম চার বছর। অর্থাৎ শরহে জামী জামাআত পর্যন্ত। যদি এই চার বছরে ইস্তেদাদ মজবুত হয়ে যায় তবে এই তালিবে ইলম এখন পাথর থেকেও ইলম আহরণ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। যদি এই চার বছরে কিতাব বোঝার যোগ্যতা অর্জন না হয়, তাহলে সামনের জামাআতে যতই কান্নাকাটি করুক কাজ হবে না। শরহে জামীর পর অনেকের ইলম শেখার খুব শওক পয়দা হয়। ইস্তেদাদ তৈরি না হয়ে থাকলে তখন করণীয় হলো, প্রথমে মেহনত করে পেছনের জামাআতের দুর্বল জায়গাগুলো মজবুত করে নিতে হবে। তারপর সামনে অগ্রসর হতে হবে।

বর্তমানে মাদরাসাগুলোর শিক্ষাগত দুরবস্থার মৌলিক কারণ হল প্রাথমিক জামাআতগুলোর তালীমী দুর্বলতা। নতুন নতুন যারা ফারেগ হয়ে আসে ওদেরকে ইস্তেদাদ তৈরীর কিতাবগুলো দেয়া হচ্ছে। অথচ এখনো সে নিজেই পড়তে জানে না, পড়াবে কি? কোন উস্তাদকে হেদায়াতুন্নাহব কিতাব পড়াতে দিতে হলে তার এই কিতাব ইয়াদ থাকতে হবে। ইয়াদ না থাকলে তার এ কিতাব পড়ানোর কোন অধিকার নেই। বছর বছর ধরে উস্তাদ পড়াচ্ছেন, তারই যদি ইয়াদ না থাকে, তাহলে ছাত্র যে এক বছর যাবৎ পড়ছে তার কীভাবে ইয়াদ থাকবে? বর্তমানে প্রাথমিক জামাআতগুলোতে নতুন নতুন ফারেগীনদের স্বল্প বেতনে রেখে নিচের কিতাব ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ কারণে ছাত্রদের ইস্তেদাদ ধ্বংসের মুখে।

মাদরাসাগুলোর শিক্ষাগত দূরবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল, যেসব ছাত্রের প্রথম জামাআতই আয়ত্ব হয় নি, প্রতিষ্ঠান তাকে দ্বিতীয় জামাতে দিয়ে দিচ্ছে। অথচ তার এখনও উর্দূ ফার্সির যোগ্যতাই হয় নি। এর চেয়ে ধ্বংসাত্মক বিষয় আর কী হতে পারে?

একভাই প্রশ্ন করেছেন, আরবী কিতাবের যে বাংলা শরাহ হচ্ছে এটা কতটুকু উচিত হচ্ছে?

প্রথমে তো উর্দূ হচ্ছে, পরে তার বাংলা হচ্ছে। সরাসরি বাংলায় তরজমা করার ক্ষমতা তো এখন কারো নেই, إلا ماشاء الله। যদি উর্দূ তরজমা মুনাসিব হয়, তাহলে বাংলা মুনাসিব। আর প্রথমটি মুনাসিব না হয় তাহলে দ্বিতীয়টিও মুনাসিব হবে না।

প্রিয় বন্ধুগণ, ইস্তিদাদ শেষ হয়ে গেছে উর্দূ শরাহগুলোর কারণে। সবচেয়ে উত্তম শরাহ হল উস্তাদের তাকরীর। উস্তাদ যা বয়ান করবে সেটা নোট করে ইয়াদ করবে। যখন থেকে উর্দূ শরাহ বাজারে এসেছে তখন থেকে ইলম অর্ধেক চলে গেছে। আগের যামানায় উস্তাদগণ হাশিয়া মুতালাআ করতেন। মনে আছে, আমার শরহেবেকায়ার বছর এক তালিবে ইলমের সাথে মোকাবেলা হয়েছিল 'মোল্লা হাসান' পড়া নিয়ে। সে দাওরা পড়ে 'মোল্লা হাসান' পড়তে এসেছিল। এই মুকাবেলার কারণে আমার 'মোল্লা হাসানে'র একটা হাশিয়াও পড়া বাদ যায়নি। যার ফল এই হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে মুতালাআর যোগ্যতা তৈরী হয়েছে। যদি আমি মুহতামিম হতাম তাহলে দেওবন্দে কোন উর্দূ শরাহ প্রবেশের অনুমতি দিতাম না। যেই তালিবে ইলমের কামরায় উর্দূ শরাহ পেতাম তাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দিতাম।

আর উর্দূ থেকে যে বাংলায় তরজমা হচ্ছে এর দ্বারা দ্বিগুণ ক্ষতি হচ্ছে; একেতো আরবীও শেষ, দ্বিতীয়ত উর্দূও শেষ। উর্দূ বোঝার যোগ্যতাও অবশিষ্ট থাকছে না। কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে একজন এসে বলল, হযরত আমি আপনার *'আসান সরফ'* বাংলা করে দিয়েছি। আমি তাকে বললাম, তুমি তো সর্বনাশ করে দিয়েছো। দীনী বইয়ের তরজমা করলে ভালো, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক তরজমা করার ফায়দা আমার বুঝে আসে না।

যেসব সহযোগী ইলম শিক্ষাজীবন শেষ করার পূর্বেই অর্জন করা জরুরী সেগুলোর মধ্যে বড় একটি বিষয় হলো, বয়ান-বক্তৃতা শেখা। যার মাধ্যমে সে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে মানুষের মাঝে দীন পৌঁছাবে। মাদরাসাগুলোতে ছাত্র সংগঠন, আঞ্জুমান ইত্যাদি গঠনের উদ্দেশ্য এটাই। বয়ান-বক্তৃতা শেখা অনেক জরুরী। নতুবা কাজ করবে কিভাবে? অনেক তাবলীগী ভাই ইলম না

থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে ১৫ মিনিট বয়ান করে দিচ্ছে। অথচ মাদরাসার তালিবে ইলম ৫ মিনিট বয়ান করতে পারছে না। কত লজ্জার কথা!

এমনিভাবে লেখা-লেখি শেখা। কেননা এছাড়া গোটা দুনিয়াবাসির কাছে পৌছা সম্ভব নয়। এজন্য মাদরাসা থেকে বেরোবার পূর্বে এটাও শেখা জরুরী।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ফারেগ হয়ে বের হওয়ার পর একজন তালিবে ইলম গোমরাহ ফেরকা ও অন্য ধর্মের লোকদের মুখোমুখিও হতে পারে। ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি সবার সঙ্গেই ইসলাম বিষয়ক আলোচনা করতে হতে পারে। তাদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের যুক্তি খণ্ডন করতে হবে। তারপর নিজের আলোচনা উপস্থাপন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে একসময় 'মায়বুযী' পড়িয়ে ছাত্রদের তর্কচর্চা করানো হতো। মায়বুযী পড়ানোর আগে 'হাদিয়ায়ে সাঈদিয়া' পড়ানো হত। তারপর 'হিদায়াতুল হিকমত' পড়ানো হতো। এরপর মায়বুযী পড়ানো হত। মায়বুযীর মুসান্নিফ পুরাতন দর্শনের সব যুক্তি খণ্ডন করে দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেক কথার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। আপত্তি উত্থাপন করাও শিখতে হয়, যাতে বাতিল মতাদর্শের উপর প্রশ্ন তোলা যায়।

আমরা সাহারানপুরে মায়বুযী পড়েছি হযরত মাওলানা সিদ্দীক হাসান সাহেব জামউঈ র.-এর কাছে। তিনি মানতেক-ফালসাফার ইমাম ছিলেন। মায়বুযীতে যখন কোন আপত্তি উত্থাপন করা হত তখন তালিবে ইলমরা জিজ্ঞেস করত, হযরত! এর জবাব কী? তখন হযরত বলতেন, তোমাদের তো উচিৎ এসব আপত্তির আলোকে আরো কিছু আপত্তি তৈরী করা। তা না করে তোমরা আপত্তির জবাব কামনা করছো? হযরতের কথা মত আমরা যখন মায়বুযী পড়তাম ভালো করে তাকরার করতাম। কিতাবের হাশিয়ায় আরও দু'চারটা আপত্তি যোগ করে দিতাম। যখন প্রশ্ন তৈরী করার যোগ্যতা অর্জন হয়ে যাবে তখন ফারেগ হয়ে বের হওয়ার পর যে কোন বাতিল দলের মুখমুখি হোক না কেন সে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে সফল হতে পারবে।

আমরা যে বছর মেশকাত পড়ি সে বছরের কথা। জানা গেল, দেওবন্দের ওমুক মন্দিরে একজন পণ্ডিত এসেছে। সে ইসলামের উপর বিভিন্ন অভিযোগ করছে। আমরা দশজন তালিবে ইলম প্রস্তুত হলাম মুকাবিলার জন্য। ঐ জলসার মধ্যেই তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। কিন্তু আমরা যদি ছাত্রদের বেশে যাই তাহলে অসুবিধা হতে পারে। তাই আমরা বেশ পাল্টে নিলাম। কারো পরনে শার্ট, কারো পরনে প্যান্ট, কেউ মাথার টুপি খুলে নিলো। সেখানে উপস্থিত হয়ে আমরা দশজন বিক্ষিপ্তভাবে বসে পড়লাম। পণ্ডিতজী আসার পর আলোচনা শুরু হল। প্রথমে সে আপত্তি ওঠাল মুসলমানদের গোশত খাওয়ার ব্যাপারে। মুসলমানরা পশুকে কষ্ট দেয়, অথচ পশুকে কষ্ট দেয়া হারাম। তার কথা শুনে একপাশ থেকে আমাদের এক তালিবে ইলম দাঁড়িয়ে গেল। বলল, 'পণ্ডিতজী, আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেবো'। পণ্ডিত বলল, বসো বেটা। সে বসে গেল। এবার আরেকজন দাঁড়ালো, 'পণ্ডিতজী, আমি আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেবো'। এবার পণ্ডিত একটু নরম হয়ে গেল, নিম্নস্বরে বলল, বসে যাও। সে বসে গেল। আরেক পাশ থেকে আরেকজন দাঁড়ালো, 'পণ্ডিত সাহেব আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো'। এবার পণ্ডিতজির অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। তার আলোচনা ওখানেই শেষ। পরের দিন সে দেওবন্দ থেকেই গায়েব। বোঝা গেল, মাদরাসা থেকে বের হয়ে কাজ করতে হলে বক্তৃতা-বয়ান, লেখালেখি আর বাতিলের জবাব এই তিন জিনিস শেখা জরুরী। এখনকার ছাত্ররা বলতেও পারে না, লিখতেও পারে না ফলে কোন বাতিল মতাদর্শের প্রতিরোধও করতে পারে না।

দীন সংরক্ষণের ধারা

একটি কথা প্রচলিত আছে- نزل القرآن في الحجاز وقرئ في مصر وفهم في الهند অর্থাৎ কুরআনে কারীম হিজাযে (মক্কা-মদিনায়) অবতীর্ণ হয়েছে, পড়া হয়েছে মিশরে আর কুরআন বুঝা হয়েছে হিন্দুস্তানে। হিন্দুস্তান বলতে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বার্মা, নেপাল, ইন্ডিয়া– সবই উদ্দেশ্য।

একথার সাথে আমি আরেকটা বিষয় বলতে চাই। কুরআন তো হিজাযে নাযিল হয়েছে। আর হাদীস শরীফও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বয়ান করেছেন। কিন্তু তিন খলিফার পর যখন হযরত আলী রাযি. খেলাফতের মারকায কূফায় স্থানান্তর করলেন, তখন দীনের তাবয়ীন ও তাশরীহ হিজায থেকে কূফায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। এরপর আর খেলাফত মদীনায় ফেরেনি। কূফায় অর্থাৎ ইরাকে সাতশ' বছর পর্যন্ত খেলাফত বিদ্যমান ছিল। সাতশ' বছর পর আব্বাসী খেলাফত দুর্বল হয়ে যায়। মিশরের খেলাফত মজবুত হয়ে যায়। তখন কুরআন ও হাদীসের তাবয়ীন ও তাশরীহ ইরাক থেকে মিশরে স্থানান্তরিত হয়। প্রায় পাঁচশ' বছর যাবৎ মিশরে কুরআন হাদীসের তাবয়ীন ও তাশরীহ হতে থাকে। বর্তমান যামানায় আমরা যেসব কিতাব পড়ি সেগুলোর অধিকাংশ ওখানকার ওলামায়ে কেরামের লেখা। মোটকথা সাতশ' বছর ইরাক ও হিজাযে। পাঁচশ' বছর মিশরে। মোট বারোশ' বছর হল। বারোশ' বছর পর কুরআন ও হাদীসের তাবয়ীন ও তাশরীহ সেখান থেকে এশিয়ায় (হিন্দুস্তান) স্থানান্তরিত হয়। এই সংযুক্ত হিন্দুস্তান যা এখন ছয় ভাগ হয়ে গেছে, এটাই এশিয়া। দু'শ পঞ্চাশ বছর যাবৎ এশিয়া থেকে কুরআনের তাবয়ীন ও তাশরীহ হচ্ছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ রহ. ছিলেন দু'শ বছর পূর্বের মানুষ। তাঁর যামানার পর দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা হয়। শাহ সাহেবের পুরা সিলসিলা দেওবন্দে চলে আসে। আর দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা হয়েছে দেড়শ' বছর হয়েছে। এই দেড়শ' বছরে আকাবিরীনে দারুল উলূম দেওবন্দ কুরআন ও হাদীসের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন সেটাই গ্রহণযোগ্য। অন্যদেরটা এখন গ্রহণযোগ্য নয়। ইরাকের কথা যদি বল, সেখানে এখন আহলে হকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। শাম ও মিশরের আবস্থাও তাই। বর্তমানে মিশরের আল-আযহার ইউনিভার্সিটির ইমামে আকবার বিদ'আতী। আযহার থেকে তুরস্ক, তুরস্ক থেকে ইরাক, ইরাক থেকে শাম, ইরান সব বিদ'আতে ভরপুর। আহমাদ রেযাখানের '*আদ্দুররুলমুখতার*'র হাশিয়া আছে। হিন্দুস্তানের কেউ জানি না। কিন্তু ঐ সকল দেশের বহু আলেমের কাছে আহমাদ রেযাখানের হাশিয়া ওয়ালা '*আদ্দুররুলমুখতার*' আছে।

এজন্য বর্তমান যামানায় কুরআনের যে তাশরীহ তাবয়ীন আছে সেটার মাধ্যম শুধু 'দেওবন্দ' হলেই গ্রহণযোগ্য। দেওবন্দিয়াত এক ফিকিরের নাম। দেওবন্দী হওয়ার জন্য দেওবন্দের নামও শোনা জরুরী না।

আকাবিরদের কিতাবের বিষয়বস্তু বুদ্ধি ও যুক্তিভিত্তিক। যুক্তির রঙ্গে সাজানো। কাজেই উলূমে আকলিয়া (মানতিক)-র মধ্যে দারক থাকা জরুরী। তাহলে আকাবিরদের কিতাব থেকে ফায়দা হাসিল করা সম্ভব। খুশির বিষয় হল,

বাংলাদেশ উলূমে আকলিয়ার দিক থেকে ইন্ডিয়ার চেয়ে অগ্রসর, কিন্ত উর্দূতে তারা পিছপা হয়ে আছে। দু'টো একত্রিত করলে আকাবিরদের কিতাব থেকে ইস্তিফাদা সম্ভব।

তো ভায়েরা, আমি বুঝাচ্ছিলাম বর্তমানে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওবন্দের মাধ্যম হয়ে এলেই গ্রহণযোগ্য। কাজেই দেশকে যদি বিদ'আত থেকে বাঁচাতে চাও আকাবিরদের উলূম মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর। এভাবে আকাবিরে দেওবন্দ থেকে দূরে সরতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছরে এদেশ বিদ'আতী হয়ে যাবে।

আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণ

আলোচনা চলছিল, মাদারেসে ইসলামিয়ার মূল ছয়টি ফন নিয়ে। প্রথমটি কুরআনুল কারীম। কিন্তু মাদরাসাগুলোতে সবচেয়ে মজলুম সহীফা হল কুরআনুল কারীম। মাদরাসা পড়ুয়ারা একপৃষ্ঠা তরজমাও সহীহভাবে করতে পারে না। إلا ماشاء الله। কিন্তু ৯৯ ভাগই পারে না। ড. ইকবাল বলেছিলেন, দুনিয়ায় কুরআনে কারীম হলো একটি মাযলূম সহীফা।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, কীভাবে? তিনি বললেন, যার কোন কাম-কাজ নেই সে-ই কুরআনের তাফসীর লিখতে আরম্ভ করে। আমরা তরজমা পড়াই তখন যখন ছাত্রের বুঝ ক্ষমতা অপোক্ত। আরবী বুঝার যোগ্যতা এখনো তার হয়নি। তারপর শুধু 'জালালাইন' পড়ানো হয়। তা-ও আবার এই কিতাব এভাবে পড়ানো হয় যে, পাঁচ পারা পর্যন্ত খুব তাকরীর চলে, যার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়। তারপর শুধু ইবারত পড়ানো হয়। কোন মাদরাসা-ই এর ব্যতিক্রম নয়। দারুল উলূম দেওবন্দও নয়। শশমাহী পর্যন্ত পাঁচ পারা পড়িয়ে বলে, সালানা এসে গেছে; এবার চলো। এখন বলো, কুরআন মাযলূম সহীফা না তো কী?। যেই কুরআনের জন্য আমাদের মাদরাসার প্রতিষ্ঠা তারই এ অবস্থা।

এমনই অবস্থা হাদীস শরীফেরও! আমাদের এখানে হাদীস ৪ বছর পড়ানো হয়, প্রথম বছর 'মিশকাতুল আসার'। তারপর 'আলফিয়াতুল হাদীস'। তারপর 'মেশকাত'। এরপর দাওরার দশ কিতাব। কিন্তু কোন মাদরাসার একজন ফাযিলকে যদি পাঁচশ' হাদীস শোনাতে বলা হয়, শোনাতে পারবে না। إلا ماشاء الله। আমার কাছে লোকজন এসে বলে, হাদীসের ইজাযত দিন। আমি ওদেরকে বলি, বিশ বছর হাদীস পড়াও, তারপর আমি তোমার পরীক্ষা নিব তুমি হাদীস বুঝেছ কি না। যদি বুঝে থাক, তাহলে ইজাযাত দিব।

আর ফিকহের অবস্থা তো এর চেয়েও শোচনীয়। কুদূরী পড়ানো হয় এমন সময় যখন তার চোখ কান কিছুই খুলে নি; এখনও সে কিশোর। এ ছাড়া ফিকহের আর কোন কিতাব পুরোটা পড়ানো হয় না। কানয অনেক মাদরাসার পাঠ্যতালিকাতেই নেই। শরহে বেকায়াও আংশিক। আর হিদায়া প্রথম খণ্ড পুরোটা পড়ানো হয়, ২য়, ৩য়, ৪র্থ অর্ধেক করেও পড়ানো হয় না। তারপর দারুল ইফতা। সেখানেও ফিকহের কোন কিতাব পুরোটা পড়ানো হয় না। মুফতী তৈরী করে অথচ ফিকহের কোন কিতাব পুরা পড়া হয়নি। এই হল ফিকহের অবস্থা। আমি বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছি যে, কমপক্ষে দারুল উলূম দেওবন্দে ফিকহের একটা মতন পুরোটা পড়ানো হোক। কিন্তু কেউ শোনে না। কারণ, যে মুফতী সাহেব দারুল ইফতায় বসা আছেন তিনিই ফিকহ পুরোটা পড়েনি! তাহলে অন্যকে পড়াবেন কী? তাহলে ফিকহও মাজলুম সহীফা সাব্যস্ত হলো।

যখন আসল ফুনূনেরই এ অবস্থা তাহলে এ তিনটির উসূলের কী দশা হবে? একটা কায়দা আছে- মুরগী আগে, না ডিম আগে। এমনই ঝগড়া এখানেও, অর্থাৎ এই ফুনূন আগে না এগুলোর উসূল আগে।

উসূলে তাফসীর তো আমাদের কোন ফাযিলই জানে না। إلا ماشاء الله। আর এ ফনের মাত্র একটা কিতাব পড়ানো হয় 'আল-ফাউযুল কাবীর' ব্যস। উসূলে হাদীসের মধ্যে শুধু নুখবা। হাদীস চার বছর পড়ানো হয় আর উসূল এক বছর!! আর মাদরাসার ছাত্ররা সবচেয়ে দুর্বল হল উসূলে ফিকহ ও ইলমে ছরফে। মাওলানা ইয়াহয়ার মাথায় জোয়ানকাল থেকেই একটা চিন্তা চেপে আছে যে, ছাত্রদের উসূলে ফিকহে মাহের বানিয়ে দেয়া উচিৎ। ফিকহ নিজে নিজেই চলে আসবে। মাসআলা উসূল থেকেই বের করে নিবে!

আরে, মাসআলা তো উসূল থেকে বের হবে কিন্তু সেটা হবে মহিষের পেট থেকে ডিম বের হওয়ার ন্যায়! মাওলানা ইয়াহয়া (যীদামাজদুহুম) দীর্ঘদিন যাবৎ আমাকে বলছে যে, আমি এমন একটা প্রতিষ্ঠান করব যেখানে উসূলে ফিকহের প্রতি বেশি জোর দেয়া হবে। সে অনেক কিতাবও সংগ্রহ করেছে। আমি সর্বদা একটা কথাই বলি, প্রথমে ফিকহ পুরোটা পড়াও তারপর উসূল পড়াও।

আমাদের মাদরাসাগুলোর আরেকটা কমতি আছে। আমরা আমাদের কমতিগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝব ইসলাহ করতে সক্ষম হব না। সেটা হল, মাদরাসায় ছাত্র বাড়ানোর প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা মাদরাসাগুলোর সর্বনাশ করে দিয়েছে। বর্তমানে মাদরাসাগুলোতে ছাত্র আসে। কোন জামাআতে পড়তে ইচ্ছুক? মিশকাত, হ্যাঁ, বসে যাও। অথচ সে হেদায়াতুন্নাহবও পড়ার যোগ্য না। মাদরাসা কেন নিয়ে নেয় তাদেরকে? ছাত্র বেশি দেখানো উদ্দেশ্য। আমার মাদরাসায় এতজন ছাত্র, এত শত ছাত্র। যে ছাত্র যে জামাআতের উপযুক্ত তাকে ঐ জামাআতে ভর্তি করতে হবে। উপরেও না, নিচেও না। আমি আমার দুই ভাইকে মিশকাত পড়ার পর আবার নিচে নামিয়ে দিয়েছি। মাওলানা আমীন পালনপুরী, মাওলানা হাবীব পালনপুরী দু'জনকেই। মাওলানা শাব্বীর, মুফতী খুরশিদ দারুল উলূমের মুফতি আমি তাদেরকে দাওরা পড়তে দিইনি। নিচে নামিয়ে দিয়েছি। আবার মিশকাত পড়িয়েছি। নিচে নামালে কোন সমস্যা নেই। উপরে উঠিয়ে দেয়া ভয়ানক।

এমনিভাবে আরেকটি সমস্যা হল, মাদরাসায় দাওরা জামাআত খোলার প্রতিযোগিতা। দাওরা থাকলে অনেকে মনে করে, আমি অনেক বড় মুহতামিম। জামাআত কম থাকলে নিজেকে ছোট মুহতামিম মনে হয়। এ জন্যে বলার সময়ও বলে আমি দাওরায়ে হাদীস মাদরাসার মুহতামিম।

ভালোভাবে বুঝে রাখুন। এদেশে সামনে আর আসা হবে কি না, জানি না। তিক্ত হলেও সত্য বলছি। এক্ষেত্রে পুরো দোষ মুহতামিমের না। কালেকশন করতে গেলে জিজ্ঞাসা করে আপনার মাদরাসা কোন জামাআত পর্যন্ত? যদি বলে শরহে জামী পর্যন্ত, তাহলে পঞ্চাশ টাকা দেয়। আর যদি বলে দাওরা পর্যন্ত তাহলে পাঁচশ' টাকা দেয়। আর যদি বলে তাকমীলে ইফতাও আছে তাহলে এক হাজার টাকা দেয়। এসব জামাআত হল পয়সা কামানো জন্য। ইলমের কোন ছিটেফোঁটা নেই।

আমি মাওলানা ইয়াহইয়ার কাছে এই দরখাস্ত করছি যে, উসূলে ফিকহ রাখ, **প্রথমে আরবী চাহারম পর্যন্ত সেরা প্রতিষ্ঠান বানাও।** (১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরতজী ইলয়াস সাহেব রহ.-এর নির্বাচিত বাণীসমূহ

ভাষান্তর : মাওলানা শফীকুর রহমান

বর্তমান বিশ্বে জনসাধারণের মাঝে সহীহ দীনী মেহনতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্যকর, নিরাপদ ও ব্যাপক মেহনতের নাম হচ্ছে দা'ওয়াত ও তাবলীগের মেহনত। বিশ্বের যেখানেই মুসলমান আছে সেখানে এ মেহনতও আছে। হক্কানী আলেমগণের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনের বদৌলতেই এ কাজ তার সঠিক সীমায় থাকবে মর্মে স্বয়ং এ ধারার প্রতিষ্ঠাতা যে অমূল্য বাণী উচ্চারণ করেছেন তার কয়েকটি নিম্নে অনুবাদ করে দেয়া হলো। এ মেহনতের সঙ্গে যুক্ত সাথীরা যদি উল্লিখিত বাণীসমূহ মনোযোগ দিয়ে পড়েন ও অনুধাবন করেন তাহলে অনেক ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবেন ইনশাআল্লাহ। -সম্পাদক

১. বর্তমানে নবুওয়াতের সিলসিলা খতম হয়ে যাওয়ার কারণে এ ধরনের কাজের যিম্মাদারী উম্মতের উলামায়ে কেরামের উপর অর্পিত হয়েছে। উলামাগণ নবীগণের ওয়ারিস। তাই তাদের জন্য জরুরী হল, তারা পথভ্রষ্টতা ও বিকৃতি থেকে জাতিকে রক্ষা করার প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করবেন। এর একমাত্র উপায় হল নিয়ত সহীহ-শুদ্ধকরণ। বস্তুত জনসাধারণের নিয়ত বিশুদ্ধ করার ফিকির করে তাদের আমলের মধ্যে লিল্লাহিয়্যাত ও হাকীকত পয়দা করা উম্মতের উলামা এবং দীনের ধারক-বাহকদের বিশেষ দায়িত্ব।

২. মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক জিনিস ও প্রতিটি কাজ তার উসূল ও নিয়ম-পদ্ধতির মাধ্যমেই সহজ হয়ে থাকে। বর্তমান সমাজে একটি সমস্যা হল, উসূলের পাবন্দীকে সমস্যা মনে করা হয় এবং তা থেকে নিজেদেরকে সবসময় দূরে রাখা হয়। অথচ দুনিয়ার সাধারণ থেকে অতিসাধারণ কাজও উসূলের পাবন্দী ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটর সাইকেল সবকিছুই নির্দিষ্ট উসূলের উপর পরিচালিত হয়। এমনকি রুটি-তরকারীও তার নিয়মমাফিক প্রস্তুত করা হয়।

৩. আমাদের মেহনত মুজাহাদার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত ইসলামের পরিপূর্ণ ইলমী ও আমলী নেযামের সঙ্গে উম্মতকে সম্পৃক্ত করে দেয়া। এটাই হচ্ছে আমাদের আসল মাকসাদ। তাবলীগী কাফেলার ঘোরাফেরা এবং গাশত হচ্ছে সেই মাকসাদ অর্জনের প্রাথমিক মাধ্যম। কালিমা, নামাজের তালকীন ও তা'লীম যেন পূর্ণ নেসাবের আলিফ-বা-তা (ক-খ-গ) মাত্র।

৪. আমাদের সাধারণ কর্মীরা যেখানেই যাবে সেখানকার স্থানীয় হক্কানী উলামা এবং বুযুর্গানে দীনের খিদমতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবে। তাদের নিকট যাবে শুধুমাত্র উপকৃত হওয়ার আশায়; সরাসরি তাদেরকে এ কাজের দাওয়াত দিবে না। ঐ সকল উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন যে সকল দীনী কাজে লিপ্ত রয়েছেন কর্মীরা সে সম্পর্কে এবং সে কাজের ফায়েদা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। উলামায়ে কেরাম যদি তোমাদের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহলে তাদেরকে মুরব্বী হিসেবে 'সার পুরস্তী'র (পৃষ্ঠপোষকতা) জন্য আবেদন জানাবে এবং তাদের প্রতি দীনী আদব ও ইহতিরাম বজায় রেখে নিজেদের কথাগুলো তাদের সামনে পেশ করবে।

৫. (একবার বয়সে ছোট এক আলেমে দীনকে লক্ষ্য করে বলেন,) মাওলানা! দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ইলম ও যিকিরের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। ইলম ছাড়া না আমল হতে পারে, না আমলের জ্ঞান বা পরিচয় হতে পারে। আর যিকির ব্যতীত ইলম অন্ধকারই অন্ধকার; তার মধ্যে নূর আসতেই পারে না। কিন্তু আমাদের কর্মীদের মধ্যে এর বড় অভাব রয়েছে। আহলে ইলম ও আহলে যিকির এ কাজকে আপন করে নিলেই কেবল তাবলীগের কাজ পূর্ণ হবে।

৬. মুসলমানগণ চার নিয়তে আলেম-উলামার খিদমত করবে-

এক. ইসলাম ধর্মের কারণে।

দুই. উলামাগণের কলব এবং দেহ উলূমে নবুওয়াতের বাহক; এ কারণেও তারা সম্মান ও খিদমতের উপযুক্ত।

তিন. তারা আমাদের দীনী কাজের নিগরানী ও দেখাশোনা করে থাকেন।

চার. আলেম-উলামার কোন কিছুর জরুরত বা প্রয়োজন আছে কি না, তা জানার জন্য।

৭. একবার দারুল উলূম দেওবন্দ ও সাহারানপুর মাদরাসায় যাবে এমন একটি জামাআতের কাছে ঐ এলাকাগুলোর উলামায়ে কেরাম বরাবর একটি পত্র লিখেন, যার ভাষ্য ছিল এরূপ–

পত্রবাহক সাধারণ মুসলমানদের এই জামাআতকে দাওয়াতের কাজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে। আপনাদের সময় অনেক মূল্যবান। আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে কিছু সময় ফারেগ করে সম্ভব হলে এই জামাআতের পৃষ্ঠপোষকতা করার অনুরোধ রইল।

আর জামাআতের সাথীদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হল যে, যদি উলামায়ে কেরাম দাওয়াতের এ কাজের প্রতি গুরুত্ব না দেন তাহলে তাদের প্রতি তোমাদের অন্তরে যেন কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়; বরং মনে করবে, তারা আমাদের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। রাত্রি বেলায় যখন অন্যরা আরামের ঘুমে বিভোর থাকে তখনও তারা ইলমে দীনের খেদমতে মশগুল থাকেন।

মনে রাখবে, বিনা কারণে একজন সাধারণ মুসলমানের প্রতি বদগুমানী বা কুধারণা করাও আত্মঘাতী ও জীবন বিনাশী কাজ। আর উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন তো আরো ভয়াবহ এবং মারাত্মক বিষয়। মুসলমানের ইজ্জত করা আর উলামায়ে কেরামের যথাযথ সম্মান করা দাওয়াত তাবলীগের বুনিয়াদী কাজ। মুসলমানকে ইজ্জত করতে হবে ইসলামের কারণে। আর উলামায়ে কেরামকে সম্মান করতে হবে ইলমে দীনের ধারক-বাহক হিসেবে।

৮. (হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. লক্ষ্ণৌ সফরে জনৈক প্রসিদ্ধ আলেমে দীনকে জামাআতের সঙ্গে আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন। ঐ মাওলানা সাহেব হযরতের ডাকে সাড়া দিয়ে জামাআতের সঙ্গে শরীক হলেন। হযরত তখন ঐ মাওলানাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,) হযরত! আমি আপনাকে ওয়াজ করার জন্য এই কষ্ট দেইনি। আমাদের এ কাজে ওয়াজ ও বক্তৃতা শুধুমাত্র একটি আনুষঙ্গিক বিষয়। আপনার মত বুযুর্গকে সফরের কষ্ট শুধুমাত্র এজন্য দিয়েছি যে,

নিজস্ব জায়গায় আপন কর্মস্থলে থাকা অবস্থায় আমার এ কাজ বোঝার এবং তা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ আপনার হয়ে ওঠে না। এখন সেসব থেকে ফারেগ হয়ে এ কাজ নিয়ে চিন্তা ফিকির করতে পারবেন।

৯. এ বিষয়টি লক্ষণীয়, আমরা যে সকল আকাবির থেকে ফয়েয হাসিল করি তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেন শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার লাইনেই থাকে। শুধু এ ক্ষেত্রেই যেন আমরা তাদের কথাবার্তা ও হালতের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকি। বাকি ব্যাপারে তথা তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারে যেন বেখবর থাকি। কেননা তা তাদের মানবীয় গুণাবলীর অংশবিশেষ। তাতে অবশ্যই কোন দুর্বলতা থাকতে পারে। মানুষ যখন সেদিকে দৃষ্টি দিবে তখন তা তাদের মাঝেও সংক্রমিত হবে। আবার কখনো মনের মাঝে বিভিন্ন প্রশ্ন ও আপত্তি দেখা দিবে, যা পরিণামে দূরত্ব সৃষ্টি ও মাহরুমীর কারণ হবে।

১০. তোমরা ঐ সকল উলামায়ে কেরামের খিদমত করো, যারা এখনও তোমাদেরকে দীন শেখানোর প্রতি মনোনিবেশ করেননি। যে সকল আলেম এখনও তোমাদের প্রতি মনোযোগ দেননি, তোমরা যদি তাদের খিদমত করতে থাক তাহলে তারাও তোমাদের দীনী খিদমত করতে শুরু করবেন।

১১. তাবলীগ জামাআতের নেসাবে তা'লীমের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, তাজবীদ। কুরআনে কারীম সহীহ-শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করা অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن

(আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিসকে এত মনোযোগ দিয়ে শোনেন না, যতটুকু শোনেন কেউ সুমিষ্ট স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করলে।

১২. যে সকল লোক দীনদারী ও দীনের ইলম থাকা সত্ত্বেও দীনের উন্নতি এবং উম্মতের ইসলাহের জন্য অতটুকু মেহনত-মুজাহাদা করে না, যতটুকু নায়েবে রাসূল হিসেবে করা প্রয়োজন, তাদের ব্যাপারে হযরতের মুখ থেকে একদিন একথা বেরিয়ে গেল যে, 'তাদের প্রতি আমার বড় দয়া হয়'। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ ইসতিগফার করার পর বললেন, আমি ইসতিগফার এজন্য করছি যে, আমার মুখ থেকে এ দাবীর কথাটা বের হয়ে গেল যে, তাদের প্রতি আমার দয়া হচ্ছে।

১৩. একবার প্রসঙ্গক্রমে সে যামানার একজন বিখ্যাত আলেম লেখক এবং দীনের খাদেমের আলোচনা আসল, যার আমলী ত্রুটির কারণে তার উপর বিশেষ দীনদার তবকার লোকদের উপত্তি ছিল। তখন এ প্রসঙ্গে হযরত বলেন, আমি তো তার কদর করি, তার মাঝে কোন আমলী ত্রুটি থাকলে আমি তা জানতেও চাই না। কেননা তা তো আল্লাহ তা'আলার ব্যাপার। হয়তো তার নিকট এর কোন ওযর আছে। আমাদের তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনভাবে দু'আ করার নির্দেশ রয়েছে যে,

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি কোন বিদ্বেষ রেখো না। (সূরা হাশর- ১০)।

অনুবাদক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

মা'হাদ প্রকাশনী
সমৃদ্ধ আগামীর পথে
مهد بروكاشني
للطباعة والنشر والتوزيع
MAHAD PROKASHONI

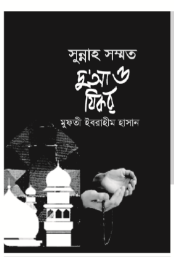

খুচরা মূল্য
১০০ টাকা মাত্র

সুন্নাহসম্মত দু'আ ও যিকর
লেখক : মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা.
মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
প্রধান মুফতী, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া

প্রাত্যহিক পাঠ্য হাদীসভিত্তিক একটি প্রামাণ্য পরিবেশনা। এতে যাপিত জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'আ ও যিকর, এর সাবলীল অনুবাদ এবং তদসংক্রান্ত মূল হাদীস ও প্রেক্ষাপট বিস্তৃতাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান
মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার নতুন সংযোজন 'মা'হাদ প্রকাশনী'

খুচরা মূল্য
৯০ টাকা মাত্র

ঈমানের বুনিয়াদী শিক্ষা
লেখক : মুফতী মাহমূদুল আমীন
মুদীর, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া
খতীব, আজিমপুর পার্টি হাউজ কলোনি জামে মসজিদ

মুমিনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ঈমান বিষয়ক অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবেশনা। এতে ঈমানের মূল ভিত্তিকে সাবলীল উপস্থাপনায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে মানুষ তার ঈমানের মূল ভিত্তিকে সব রকমের কুসংস্কার ও আগ্রাসন থেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়।

প্রাপ্তিস্থান
মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা গার্ডেন সিটি, ০১৭৯৬৭৩৪২৯৬, ০১৭৪২০৫০২০৬। রাহমানিয়া লাইব্রেরী, ৬৫ সাতমসজিদ সুপার মার্কেট, মুহাম্মাদপুর, ০১৬১৬৮৮২৪০৯। আবাহন, এন/১৪ নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ০১৬৭৮০২৫২৬০। পার্টি হাউজ কলোনি জামে মসজিদ, আজিমপুর, ০১৮১১২২৮৯৯২। বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ০১৯২২১০৬৬২০।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাযহাব

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

মুসলমানগণ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত থাকা সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে হাদীস ও সুন্নাহর অনুসরণ নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কে লিপ্ত। সাহাবা যুগ থেকে চলে আসা মাযহাব-ধারা একশ্রেণীর ভাষ্যে নতুন সৃষ্ট বিষয়। মুজতাহিদ ইমামগণ এবং তাদের সংকলিত মাযহাব ঐ শ্রেণীর বক্তব্যে ঐক্যবিনাশী বিষয়। তারা মাযহাবের অনুসরণকে শিরকী কাজ এবং কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে ব্যক্তিপূজার নতুন রূপ বলে প্রচার করছে। অথচ ফিকহের এই মাযহাবগুলো কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধানেরই ব্যাখ্যা এবং তার সুবিন্যস্ত সংকলিত রূপ। মূলত তা ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণের মাযহাব, যা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মপরম্পরা তথা তাওয়ারুসের মাধ্যমে চলে আসছে।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে ফিকহী মাযহাব

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. (১৬১হি.-১৩৪হি.) ইমাম বুখারী রহ. এর একজন শ্রেষ্ঠ উস্তাদ। ইমাম বুখারী রহ.-এর সময়ে অসংখ্য মনীষী আলেম ছিলেন যারা তাঁর সম্মানিত উস্তাদ, কিন্তু আলী ইবনুল মাদীনীর ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ.-এর যে উচ্চ মন্তব্য পাওয়া যায় তা তাঁর অন্য কোন উস্তাদের ব্যাপারে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন,

ما استصغرت نفسى احدا الا عند على بن المدينى.

অর্থ : আলী ইবনুল মাদীনীর (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) সামনে নিজেকে যতটা ক্ষুদ্র মনে হয় তা আর কারো সামনে হয় না। (তাযকিরাতুল হুফফায ২/১৩)

আলী ইবনুল মাদীনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল ইলাল-এ মাযহাবের ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের সে সব ফকীহর কথা আলোচনা করেছেন, যাদের শাগরিদগণ তাদের ফতওয়া ও সিদ্ধান্তগুলো সংরক্ষণ করেছেন এবং যাদের মাযহাব ও তরীকার উপর আমল ও ফতওয়া চালু ছিল। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলেন তিনজন, এক. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. (মৃত্যু ৩২ হি.), দুই. যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. (মৃত্যু ৪৫ হি.) ও তিন. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. (মৃত্যু ৬৮ হি.)। লক্ষণীয় বিষয় হল, উক্ত আলোচনায় ইবনুল মাদীনীর নির্বাচিত বাক্যে 'মাযহাব' ও 'ফতওয়া' শব্দ দু'টিই ব্যবহার হয়েছে।

لم يكن فى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحيبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته الا ثلاثة...

এরপর তিনি তাদের প্রত্যেকের মাযহাবের অনুসারী এবং তাদের মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দানকারী ফকীহ তাবেঈগণের নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর শাগরিদগণ তাঁর কিরাআত অনুযায়ী মানুষকে কুরআন শেখাতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষকে ফতওয়া দিতেন এবং তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতেন। এরা হলেন, আলকামা (মৃত্যু ৬২ হি.), আসওয়াদ (মৃত্যু ৭৫ হি.), মাসরূক (মৃত্যু ৬২ হি.), আবীদাহ (মৃত্যু ৭২ হি.), আমর ইবনে শুরাহবীল (মৃত্যু ৬৩ হি.) ও হারিস ইবনে কাইস (মৃত্যু ৩৬ হি.)।

ইবনুল মাদীনী রহ. বলেছেন, এই ছয়জনের নাম ইবরাহীম নাখায়ী রহ. (মৃত্যু ৯৬ হি.) উল্লেখ করেছেন। ইবনুল মাদীনী রহ. এর আরবী পাঠ নিম্নরূপ,

الذين يقرءون الناس بقرائته ويفتونهم بقوله ويذهبون مذهبه...

এরপর আলী ইবনুল মাদীনী রহ. লিখেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর ফকীহ শাগরিদদের সম্পর্কে এবং তাদের মাযহাবের বিষয়ে সবচেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন ইবরাহীম নাখায়ী ও আমের ইবনে শুরাহবীল শা'বী (মৃত্যু ১০৩ হি.)। তবে শা'বী রহ. মাসরূক রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন। আরবী পাঠ নিম্নরূপ,

وكان اعلم اهل الكوفة باصحاب عبد الله ومذهبهم ابراهيم والشعبى الا ان الشعبى كان يذهب مذهب مسروق.

এরপর লিখেছেন, যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর যে শাগরিদগণ তার মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং তার মত ও সিদ্ধান্তসমূহ সংরক্ষণ ও প্রচারে মগ্ন ছিলেন তারা বারোজন।

তাদের নাম উল্লেখ করার পর ইবনুল মাদীনী রহ. লেখেন, এই বারো মনীষী ও তাদের মাযহাবের বিষয়ে সবচেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন ইবনে শিহাব যুহরী (৫৮-১২৪ হি.), ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (মৃত্যু ১৪৩ হি.), আবুয যিনাদ (৬৫-১৩১ হি.) ও আবূ বকর ইবনে হায্ম (মৃত্যু ১২০ হি.)। এদের পরে ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. (৯৩-১৭৯ হি.) তাদের মাযহাবের বিষয়ে সবচেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন।

এরপর ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন,

وكما ان اصحاب ابن عباس ستة الذين يقومون بقوله ويفتون به ويذهبون مذهبه.

তদ্রূপ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর যে শাগরিদগণ তার মত ও সিদ্ধান্তসমূহ সংরক্ষণ ও প্রচারে মগ্ন ছিলেন, সে অনুযায়ী ফতওয়া দিতেন এবং তার অনুসরণ করতেন তারা ছিলেন ছয়জন।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. তার 'কিতাবুল ইলাল' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৫৪) সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা মাযহাবের ইতিহাস এভাবে সবিস্তারে সুস্পষ্ট বাক্যে তুলে ধরেছেন।[1]

ইবনুল মাদীনীর আলোচনা এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, ফিকহের চার মাযহাব সাহাবায়ে কেরামের ফিকহী মাযহাবেরই উত্তরসূরী। ইমাম মালেক রহ. এর নাম তো পূর্বোক্ত ইতিহাসে উল্লেখ হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইমাম শা'বী রহ. এর শাগরিদ ছিলেন। তিনি ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর খাস শাগরিদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রহ.-এর সান্নিধ্যে ছিলেন আঠারো বছর। তিনি তারই স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর মাযহাব তার খাস শাগরিদ আতা ইবনে আবী রাবাহ, আমর ইবনে দীনার প্রমুখ থেকে লাভ করেন। যায়েদ ইবনে সাবেত প্রমুখ ফকীহ সাহাবীদের মাযহাব ও ফতওয়া তিনি তার অন্যান্য তাবেয়ী উস্তাদদের কাছ থেকে হাসিল করেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমাদ রহ.ও বিভিন্ন সনদে এই ফিকহী মাযহাবগুলোর উত্তরসূরী। (সূত্র : ওয়াহদাতুল উম্মাহ)

---

১. ইবনে হাযম রহ. আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম-এ ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর কেন্দ্রিক সাহাবা যুগ থেকে ফিকহের যে ধারা চলে এসেছে তা তাফসীলের সাথে তুলে ধরেছেন।

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেছেন, কুফার সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন আলী রাযি. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.। তাদের শাগরিদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ আলকামা রহ.। তার শাগরিদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন ইবরাহীম নাখায়ী রহ.। ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর শাগরিদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান রহ.। তার শাগরিদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন আবূ হানীফা রহ.। তার শাগরিদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন আবূ ইউসুফ রহ.। আবূ ইউসুফ রহ.-এর শাগরিদরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।[2] এরপর ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, আবূ ইউসুফ রহ.-এর শাগরিদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.। তার শাগরিদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ইমাম শাফেয়ী রহ.। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর শাগরিদদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় ফকীহ, তা খোদ ইমাম শাফেয়ী-ই তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, বাগদাদে আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞ, বড় ফকীহ ও খোদাভীরু কাউকে রেখে যাইনি। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২১/২৩৩)

আরবী পাঠ-

خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل.

ফিকহ জটিলতর একটি শাস্ত্র

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. (১২৯২-১৩৫২ হি.) ছিলেন নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং ফকীহ। মেধার প্রখরতা ও মুখস্থ শক্তিতে ছিলেন আল্লাহর একটি নিদর্শন। তিনি ছিলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মহাসমুদ্র। এই মহামনীষীর সরল স্বীকারোক্তি হলো, আমার কাছে ফিকহের চেয়ে কঠিন কোন শাস্ত্র নেই। সকল শাস্ত্রে আমার নিজস্ব গবেষণা ও লব্ধ সিদ্ধান্ত রয়েছে; কিন্তু ফিকহে আমি স্রেফ একজন মুকাল্লিদ।[3] (ফয়যুল বারী ৪/১৯৭)

আরবী পাঠ-

وليس عندي فن أصعب من الفقه، حتى أني في الفنون كلها ذو رأي وتجربة، أحكم بما أريد، وأنتخب من أقوالهم ما أريد، وأفترع الآراء من عندي لا أحتاج إلى تقليد أحد، ولكني في الفقه مقلد بحت.

ফিকহের ব্যাপারে এই অনুভূতি সব যুগেই সকল বিজ্ঞ আলেম ও মুহাদ্দিসদের ছিল। এ কারণে তারা হাদীসের মহান পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ফিকহী বিষয়ে ফকীহদের শরণাপন্ন হতেন। তাদের ফিকহ অনুযায়ী ফতওয়া দিতেন (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে)। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দিতে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী (১৩৫-১৯৮ হি.) ছিলেন একজন প্রবাদতুল্য মুহাদ্দিস। ইমাম বুখারী রহ.-এর শ্রেষ্ঠ উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, যদি আমি হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মত পবিত্রতম স্থানে দাঁড়িয়ে হলফ করতাম তাহলে এই হলফ করতাম যে, হাদীস শাস্ত্রে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমি কাউকে দেখিনি। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৫৯৭)

আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীর প্রসিদ্ধি যখন চতুর্মুখী, মুসলিম জাহানের মুহাদ্দিসগণ যে সময় ইলমে হাদীসের জটিল থেকে জটিলতম বিষয়ে তার শরণাপন্ন হতেন, সে সময় ফিকহ সংক্রান্ত বিষয় জানার জন্য তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস রহ.-এর কাছে মুরাজা'আত করেন। এই মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস পরবর্তীতে ইসলামের মহান ফকীহ ইমাম শাফেয়ী (১৫০-২০৪ হি.) নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ. কে চিঠি মারফত তার জন্য একটি কিতাব রচনার অনুরোধ করেন, যে কিতাবে কুরআনের চয়নকৃত নির্দিষ্ট অংশের অর্থ ও উদ্দেশ্যের আলোচনা থাকবে, যাতে (ফিকহী মাসআলায়) কুরআনের সাথে হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি, ইজমা দলীল হওয়া সংক্রান্ত বিষয় ও নাসেখ-মানসূখের বিষয়গুলোও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সন্নিবেশিত হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. সে চিঠির জবাবে তার বিখ্যাত 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থটি লিখেছিলেন। (আল-ইনতিফা ফী ফাযাইলিস সালাসাতিল আইম্মাহ আল-ফুকাহা; পৃষ্ঠা ৭২)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার লিখেছেন,

فاجابه الشافعى وهو كتاب الرسالة ...وانما رسالة الى عبد الرحمن بن مهدى.

ফিকহের গভীরতা উপলব্ধি করে হাফেযে হাদীস আবূ আলী নাইসাবুরী (মৃত্যু ৩৫৭ হি.) মন্তব্য করেছেন,

الفهم عندنا اجل من الحفظ.

অর্থ : হাদীসের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারা হাদীস মুখস্থ করতে পারার চেয়ে বেশি কিছু। (তারীখে দিমাশক ৬৪/৩৬১)

ফকীহ নন এমন মুহাদ্দিসগণ নিজেদেরকে 'সায়াদিলা' বলে পরিচয় দিতেন

মুহাদ্দিসগণ ফিকহের ব্যাপারে বাস্তবসম্মত অনুভূতি রাখতেন এবং ফিকহের কাঠিন্যের বিষয়ে অকপট স্বীকারোক্তি দিতেন। তারা নিজেদেরকে 'সায়াদিলা' (ঔষধ বিতরণকারী/ফার্মাসিস্ট) বলে পরিচয় দিতেন। আর ফকীহ মুহাদ্দিসদের 'ডাক্তার' বলে স্বীকৃতি দিতেন। অর্থাৎ হাদীস নামক হাজারো ঔষধ তো আমাদের কাছে রয়েছে; কিন্তু এক বিষয়ের বিরোধপূর্ণ হাদীসের সমাধান, মর্মোদ্ধার ও মর্ম নির্ধারণ, নাসিখ-মানসূখ ও ইজতিহাদের অন্যান্য শর্ত পূরণ করত সঠিক বিষয় অনুধাবন করে সঠিক স্থানে প্রয়োগ করা ফকীহদের কাজ। উবাইদুল্লাহ ইবনে আমর এর বর্ণনা এ দাবীর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, আমি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আ'মাশ রহ.-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে একব্যক্তি এসে মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তর দিতে পারছিলেন না। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজলেন; দেখলেন আবূ হানীফা রয়েছে উক্ত মজলিসে। তিনি বললেন, ওহে নো'মান! প্রশ্নের সমাধান তুমি দাও। আবূ হানীফা রহ. সমাধান দিলেন এবং এমন সমাধান দিলেন যে, আ'মাশ রহ. একই সঙ্গে পুলকিত ও অবাক হলেন। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এই সমাধান কোথায় পেলে? আবূ হানীফা রহ. বললেন, আপনি আমাদের কাছে অমুক হাদীস

---

২. আরবী পাঠ,

فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق...

৩. মূলত ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস। যার স্বীকৃতি তৎকালীন সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ দিয়েছেন। মিস'আর ইবনে কিদাম বলেন, আমি আবূ হানীফার সাথে হাদীস অন্বেষণে নেমেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার উপর বিজয় লাভ করেছেন। ... এবং তার সঙ্গে ফিকহ অন্বেষণে নেমেছিলাম। এক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব তো তোমরা দেখতেই পারছো। (মানাকিবু আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি ১/৪৩)

আরবী পাঠ-

عن مسعر بن كدام قال طلبنا مع ابى حنيفة الحديث فغلبنا ... وطلبنا معه الفقه فجاء منه ما ترون.

মিস'আর ইবনে কিদাম (মৃত্যু ১৫২ হি.) ছিলেন এমন উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস যে, শু'বা এবং সুফিয়ান –যারা 'আমীরুল মুমিনীন ফিল-হাদীস' (হাদীস সম্রাট ছিলেন)– নিজেদের মধ্যে কোন হাদীস নিয়ে মতভেদ হলে বলতেন, اذهبا بنا إلى الميزان مسعر (অর্থ) সমাধানের জন্য চলো এ বিষয়ের 'দাড়িপাল্লা' মিস'আরের কাছে যাই। (আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল; পৃষ্ঠা ৩৯৫)

বর্ণনা করেছেন; সেখান থেকে এ সমাধান খুঁজে পেয়েছি। তখন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আ'মাশ রহ. অকপটে ফকীহদের শ্রেষ্ঠত্বের সেই বিখ্যাত উক্তি উচ্চারণ করলেন,

نحن الصيادلة وانتم الاطباء.

অর্থ : আমরা তো ঔষধ বিক্রেতা, তোমরা হলে ডাক্তার। (কোন হাদীস কোন মাসআলায় কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তোমরা ভালো জানো।) (আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান ৮/৪৬৭)

ইমাম যাহাবী মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা (১/৩৯) -এ বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ রহ. এর কাছে কেউ যখন জটিল কোন বিষয় জানতে চাইত তিনি ইমাম আবূ হানীফার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী'তে সূত্রসহ এমন একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. হাদীস বিশারদদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

انتم الصيادلة ونحن الاطباء.

অর্থ : তোমরা হলে ঔষধ বিতরণকারী, আর আমরা সেই ঔষধ প্রয়োগের উপযুক্ত স্থান নির্ধারণকারী 'ডাক্তার'। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/২৪৩)

হাফেযে হাদীস আবূ মুহাম্মাদ আল-হারেসী বর্ণনা করেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইয়াযিদ ইবনে হারূন বসা ছিলেন। তার কাছে উপবিষ্ট ছিল ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, যুহাইর ইবনে হারব ও অন্যান্য বড় বড় মুহাদ্দিসগণ। এরই মধ্যে এক প্রশ্নকারীর আগমন ঘটল। সে ইয়াযিদ ইবনে হারূনকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। ইয়াযিদ তাকে বললেন,

اذهب الى اهل العلم.

অর্থ : তুমি আহলে ইলমের কাছে যাও। এ কথা শুনে আলী ইবনুল মাদীনী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার কাছে উপবিষ্টদের মধ্যে কী আহলে ইলম এবং হাদীসের পণ্ডিত নেই? ইয়াযিদ ইবনে হারূন বললেন,

اهل العلم اصحاب ابي حنيفة وانتم صيادلة.

অর্থ : আহলে ইলম তো আবূ হানীফার শাগরিদগণ; তোমরা তো হলে 'সায়াদিলা' (ঔষধ বিতরণকারী)। (সদরুল আইম্মা মুয়াফফিক ইবনে আহমাদ মাক্কী 'মানাকিবে ইমাম আ'যম' নামক গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন- ২/৪৭)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম ছিলেন ডাক্তার, মুহাদ্দিসগণ ছিলেন ঔষধ বিতরণকারী।

এরপর মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী রহ. এর আগমন হল। যিনি একই সাথে ঔষধ বিতরণকারী ও ডাক্তার ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ফকীহ ছিলেন এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। (তারীখে দিমাশ্ক লি-ইবনে আসাকির ৫১/৩৩৪)[৪]

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. এর বর্ণনাকৃত ঘটনা উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা তুলে ধরে। তিনি সূত্রসহ বর্ণনা করেন, এক মহিলা মারা গেল। সেখানে হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ইবনে মাঈন এবং দাওরাকী উপস্থিত হলেন। তারা মায়্যিতকে গোসল দেয়ার জন্য লোক খুঁজছিলেন কিন্তু একজন হায়েযা মহিলা ছাড়া কাউকে পেলেন না। হায়েযা মহিলা গোসল দিতে পারবে কি না! বিষয়টি তাদেরকে ভাবিয়ে তুলছিল। কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না এবং কোন সিদ্ধান্তও দিতে পারছিলেন না। ইতোমধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এলেন এবং হায়েযা মহিলার জন্য মৃত মহিলাকে গোসল দেয়া জায়েয বলে ফতওয়া দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করনি যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার জন্য আয়েশা রাযি. এর কাছে মগ চাইলেন। আয়েশা রাযি. বললেন, আমি তো ঋতুবতী (মগ ধরলে তা নাপাক হয়ে যাবে না!?)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

ان حيضتك ليست في يدك.

অর্থ : তুমি ঋতুবতী ঠিক কিন্তু হায়েয তো তোমার হাতে (লেগে) নেই। (তাবাকাতে হানাবিলা লি-ইবনি রাজাব ১/৫২)

এটাও একটি বাস্তবতা যে, 'সায়দালা' শব্দটি মুহাদ্দিসদের ব্যাপারে তাদের কর্মের স্বীকৃতি ও প্রশংসা স্বরূপও ব্যবহার হয়েছে। আবূ সুলাইমান ছিলেন একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস। ইমাম তহাবী রহ. একবার তার সংগৃহীত হাদীসের ভাণ্ডার দেখলেন এবং মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন,

انتم الصيادلة ونحن الاطباء.

অর্থ : তোমরা তো ঔষধের বিশাল ভাণ্ডার জমাকারী, আমরা সে ঔষধ ব্যবহারের সঠিক পরামর্শদাতা মাত্র। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪০৯)

মুহাদ্দিস ও ফকীহদের কর্মবণ্টন হাদীস থেকে প্রমাণিত

মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মাঝে এই যে কর্মের পার্থক্য তা রাসূলের হাদীস থেকে প্রমাণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم...

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল, ভূমিতে বর্ষিত প্রবল বৃষ্টি। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর; যা সেই পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭৯)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, প্রথম প্রকার ভূমি দ্বারা মুখস্থ শক্তি ও বুঝ শক্তি সম্পন্ন এমন আলেম উদ্দেশ্য; যারা ইলমে ওহী মুখস্থ করেন, আত্মস্থ করেন এবং তার উদ্দেশ্য ও মর্ম যথাযথ বুঝতে সক্ষম হন। তার গভীর থেকে বিধি-বিধানের মূলনীতি, মাসআলা-মাসাইল বের করতে পারদর্শী। আর দ্বিতীয় প্রকার দ্বারা উদ্দেশ্য এমন আহলে ইলম; যাদেরকে মুখস্থ শক্তি দান করা হয়েছে, কিন্তু ইলমে ওহীর উদ্দেশ্য ও পুরোপুরি মর্মোদ্ধার এবং হাদীস থেকে মাসআলা-মাসাইল বের করতে সক্ষম নয়। (মিফতাহু দারিস সা'আদা লি-ইবনিল কাইয়িম ১/৬০)[৫]

উলামায়ে কেরামের কর্মের দু'টি ধারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একটি হাদীস থেকেও প্রতীয়মান। তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দোজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে, তারপর তা সঠিকভাবে মনে রেখেছে এবং সেভাবেই অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক ফিকহ বহনকারী আছে, যারা নিজেদের তুলনায় উন্নততর ফিকহ ও বুঝ শক্তির অধিকারীর নিকট তা পৌঁছে দেয়। এবং অনেক ফিকহের বাহক এমন রয়েছে যার নিজের বহনকৃত ফিকহ বিষয়ে বুঝ নেই। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৫৬)

---

৪. আরবী পাঠ এরূপ,

كان الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة فجاء محمد بن إدريس الشافعي طبيبا صيدلانيا ما مقلت العيون مثله أبدا.

৫. আরবী হল,

اهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الاحكام والحكم والفوائد منه ... القسم الثاني اهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه.

সাহাবাযুগ থেকে দু'টি ধারা চলে আসছে

সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। সাহাবীরা সংখ্যায় ছিলেন লক্ষাধিক। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। শুধু বুখারী শরীফে বর্ণিত যাদের বর্ণনা এসেছে এমন সাহাবীর সংখ্যা একশত সাতাশ। কিন্তু ফিকহ-ফতওয়ার কাজ করেছেন এমন সাহাবীর সংখ্যা গণনা করলে দেড়শ'ও পুরা হয় না। ইবনে হাযম যাহেরীর বর্ণনামতে এমন সাহাবীর সংখ্যা সব মিলিয়ে একশ' ত্রিশের কিছু বেশি। তিনি বলেন, সাহাবাদের মধ্যে অধিক ফতওয়া প্রদানকারী মাত্র সাতজন। তাদেরকে সাহাবায়ে কেরামও কুরআন-সুন্নাহর বড় আলেম বলে স্বীকৃতি দিতেন। (আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম; পৃষ্ঠা ৭০৩)[৬]

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. ছিলেন বড় সাত ফকীহের একজন। তার সম্পর্কে আবূ মাসউদ রাযি. মন্তব্য করেছেন, খোদার কসম! আমার জানা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে ছেড়ে যাননি। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৪৬১)

ما أعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم.

জলীলুল কদর সাহাবী আবূ মূসা আশআরী রাযি. হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এই মহাজ্ঞানী যতদিন তোমাদের মাঝে থাকবে তোমরা আমাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৮৩৬)

لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.

ইবনে আব্বাস রাযি. ছিলেন সাহাবাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ সাত মুজতাহিদ ফকীহর অন্যতম। তার ব্যাপারে ইবনে হাযম বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ফতওয়ার যতটুকু সংকলন করা হয়েছে সেটা বড় বড় সাতটি পাণ্ডুলিপির আকার ধারণ করেছে।[৭] তিনি আরো বলেন, সাহাবায়ে কেরাম যেমন হাদীস শুনেছেন ইবনে আব্বাস রাযি.ও হাদীস শুনেছেন। যেমনিভাবে সাহাবাগণ হাদীস মুখস্থ করেছেন তিনিও মুখস্থ করেছেন; কিন্তু তার ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর, ফসল উৎপাদনের সর্বোচ্চ উপযোগী। অতএব তাতে তিনি নুসূস (হাদীস) এর বীজ বপন করেছেন এবং সে যমীনে প্রচুর ফসল (ফিকহী সমাধান) উৎপন্ন হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন, কোথায় ইবনে আব্বাস রাযি. এর ফতওয়া, তাফসীর আর ইসতিম্বাত! আর কোথায় আবূ হুরাইরা রাযি. এর ফতওয়া, তাফসীর! আবূ হুরাইরা তার চেয়ে বড় হাফেযে হাদীস ছিলেন; বরং পুরো উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস ছিলেন ..., তার ঝোঁক ছিল হাদীস মুখস্থের প্রতি এবং যেমন শুনেছেন তেমনই পৌঁছানোর প্রতি। অপরদিকে ইবনে আব্বাস রাযি. এর ঝোঁক ছিল তাফাক্কুহ ও গভীর থেকে মাসআলা অনুসন্ধান ও বের করার প্রতি এবং নুসূস খনন করে তা থেকে ফোয়ারা নিঃসরণ ও খনিজ আহরণের প্রতি। (আল-ওয়াবিলুস ছাইয়িব বিল-কালিমিত তাইয়িব ১/৭২)[৮]

আল্লামা ইবনে হাযম রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ী সাহাবা যুগের পর ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান তিন জ্ঞানশহরের অধিবাসীগণ সাধারণত নিজ নিজ কেন্দ্রীয় ব্যক্তির ফতওয়া ও ফিকহী সিদ্ধান্তের বাইরে যেতেন না। মদীনাবাসী ইবনে উমর রাযি. এর, কুফাবাসী ইবনে মাসঊদ রাযি. এর, মক্কাবাসী ইবনে আব্বাস রাযি. এর ফতওয়াকে প্রাধান্য দিতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ফতওয়ার বাইরে যেতেন না। (আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম ২/২৮)[৯]

পূর্বের আলোচনা গভীরভাবে পাঠ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সাহাবাযুগ থেকেই উলামায়ে কেরামের একটি শ্রেণী হাদীস মুখস্থ ও হুবহু বর্ণনার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। ফিকহ ও বিধান সংক্রান্ত বিষয়ের সম্মুখীন হলে তারা ফকীহ মুজতাহিদ সাহাবীদের শরণাপন্ন হতেন এবং অন্যদেরকেও হতে বলতেন।

অনুরূপ পরবর্তী যুগেও প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তি তো বটেই প্রত্যেক আলেমেরও ফতওয়া দেয়ার অধিকার ছিল না। বরং ফিকহ ফতওয়ার কাজ করার অধিকার কেবল যোগ্য ব্যক্তিদের ছিল। সহীহ সূত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত ঘটনাটি লক্ষ্য করুন, ইয়াকুব ইবনে কাসেব এক আলেম থেকে বর্ণনা করেন, মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদের যুগে হজ্জের মওসুমে একঘোষক ঘোষণা করছিল,

لا يفتى الحاج الا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمرو ومالك بن انس.

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, উবাইদুল্লাহ ইবনে আমর এবং মালেক ইবনে আনাস ছাড়া কেউ যেন হাজীদের ফতওয়া প্রদান না করে। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/১০৫)

অথচ সেই সময় তাদের সমতুল্য আরো অনেক মুহাদ্দিসই বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেককে ফতওয়া প্রদানের অধিকার দেয়া হল না। আজকাল তো আলেম বহুদূর, সাধারণ দিনমজুর, রিক্সাচালক অজ্ঞরাও ফতওয়া দেয়াকে নিজের অধিকার মনে করে।

ফকীহ ও মুহাদ্দিসের কর্মপার্থক্যের বিষয়টি রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থ মনোযোগ দিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখলেও পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ বিষয়ের গ্রন্থে এ রকম প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যে, কারো ব্যাপারে বলা হচ্ছে احفظ (অধিক মুখস্থ শক্তির অধিকারী), কারো ব্যাপারে মন্তব্য হচ্ছে افقه (অধিক ফিকহের অধিকারী)। ইবনে আবী হাতেম ও তার পিতা ছিলেন 'জরাহ' ও 'তা'দীল' এর প্রখ্যাত ইমাম। তাদের কথোপকথনে ব্যবহৃত ও চয়নকৃত শব্দ লক্ষ্য করুন। ইবনে আবী হাতেম তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আলী ইবনুল মাদীনী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মধ্য থেকে কে অধিক মুখস্থ শক্তির অধিকারী? তিনি উত্তরে বললেন, হিফয শক্তিতে দু'জনই সমান। কিন্তু আহমাদ 'আফকাহ' (অধিক ফিকহ ও বুঝ শক্তির অধিকারী)। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২১/২৩৬)

হাদীস মুখস্থ করা আর হাদীসের তাফাক্কুহ বা গভীরতা উপলব্ধি করা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়, **(৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

---

৬. তিনি বলেন,

ثم لم ترو الفتيا في العبادات والأحكام إلا عن مائة ونيف وثلاثين منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصي الشديد.

৭. হাফেয ইবনুল কাইয়িম রহ. উক্ত বক্তব্যটি নকল করেছেন। ইবনে হাযম রহ. এর কিতাব আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম (২/৩৩৬) গ্রন্থে যে বক্তব্য পাওয়া গেছে তা হলো,

وقد جمع ابو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن امير المؤمنين المامون فتيا عبد الله بن عباس فى عشرين كتابا وابو بكر المذكور احد ائمة الاسلام فى العلم والحديث.

৮. আরবী পাঠ,

واين تقع فتاوي ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي ابي هريرة وتفسيره وابو هريرة احفظ منه بل هو حافظ الامة على الاطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ... فكانت همته مصروفة الى الحفظ وبلغ ما حفظه كما سمعه وهمة ابن عباس مصروفه الى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الانهار منها واستخراج كنوزها.

৯. তিনি বলেন,

فإذا تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة وكانوا لا يتعدون فتاويهم ... كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس.

চলে গেলেন জামি'আ রাহমানিয়ার একজন দরদী অভিভাবক

মুফতী সাঈদ আহমাদ

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া সাতমসজিদ মাদরাসার জমিদাতা দু-ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই জনাব আলহাজ্জ মোহাম্মাদ আলী গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ মোতাবেক ২১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হি. রোজ সোমবার রাত ১২.৩০ মিনিটে ইন্তিকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জমিদাতা ওয়াকিফ হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন জামি'আর পরিচালনা পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। স্ত্রী, চার ছেলে ও দুই মেয়ে তার উত্তরাধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে নেক হায়াত দান করুন। আমীন।

মরহুম মোহাম্মদ আলী রহ. ঢাকার পার্শ্ববর্তী বসিলা গ্রামের আদি বাসিন্দা। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে তিনি ও তার ছোট ভাই মরহুম নূর হুসাইন রহ. সিলেটের বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত নূরুদ্দীন গহরপুরী রহ. এর মুরীদ ছিলেন। মুর্শিদের পরামর্শেই জামি'আ রাহমানিয়ার জন্মলগ্ন থেকে তারা দুই ভাই জামি'আর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে ছিলেন। হযরত গওহরপুরী রহ. ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে এক সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মৃত্যুর পর কার পরামর্শে চলবেন। তখন তিনি তার পরবর্তী মুর্শিদ হযরত মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. কে নির্ধারণ করে দেন। হযরত গওহরপুরী রহ. এর ইন্তিকালের পর তিনি আমৃত্যু হযরত মুফতী সাহেব হুযূরকে নিজের মুর্শিদ মেনে চলেছেন।

জামি'আ রাহমানিয়াকে জনাব মরহুম আপন ঘরের চেয়ে আপন ভাবতেন। জামি'আর জন্মলগ্নে একবার তাদের নিজস্ব নির্মাণাধীন ভবনে জামি'আর কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দিয়েছিলেন। এরপর জমি দান, সুরম্য পাঁচতলা ভবন নির্মাণ, এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি ইট-বালির সাথে তার ও তার ছোট ভাইয়ের শ্রম ও অর্থের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তারা জামি'আর পাশে ছিলেন।

দেশের ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'আ রাহমানিয়ার রয়েছে একটি করুণ ইতিহাস। আঘাত-প্রতিঘাতে যখন জামি'আর ভবন ও কর্তৃপক্ষ জর্জরিত হয়েছে তখন মরহুম ভ্রাতৃদ্বয় সে আঘাত নিজেদের জানের উপর আঘাত হিসেবে গণ্য করেছেন। এর জন্য শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত হয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই এবং কিছু সময়ের জন্যও জামি'আর সঙ্গ ছাড়েননি। জামি'আর ভবন বেদখল হওয়ার পর জামি'আর উস্তাদ-ছাত্রের যখন আক্ষরিক অর্থেই 'পথে বসা'র উপক্রম হয়েছিল তখন জামি'আর গোটা কার্যক্রম তাদের নিজস্ব বিল্ডিংয়ে আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ করে দিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা জামি'আর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, ইনশা-আল্লাহ। সাথে সাথে তারা কয়েক দিনের মধ্যে নিজস্ব জায়গায় জামি'আর উপযোগী বিকল্প বহু টিনশেড করে জামি'আর কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্য যে তড়িৎ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাতে এত বড় দুর্যোগ সত্ত্বেও জামি'আর কার্যক্রম একদিনের জন্যও ব্যাহত হয়নি।

জামি'আর অস্থায়ী অবস্থানে হলরুম, ছাত্রদের থাকার রুম, টয়লেট, রান্নাঘর, গ্যাস, বিদ্যুত যখন যেভাবে প্রয়োজন হয়েছে ঠিক সেভাবেই প্রস্তুত করে দিতে সচেষ্ট ছিলেন তারা। এমনকি বছর শেষে যখন সাধারণ ফান্ডে অর্থ সঙ্কটের কারণে নির্ধারিত ভাড়া কয়েক মাস বকেয়া পড়ে যেত তখন তার পুরোটাই খুশিমনে মওকুফ করে দিতেন।

ছোট ভাই আলহাজ্জ নূর হুসাইন সাহেবের ইন্তিকালের পর বড় ভাই আলহাজ্জ মোহাম্মাদ আলী জামি'আর সঙ্গে লেগে থাকেন ছায়ার মত। অনেক সময় তিনি নিজ বাসায় প্রস্তুতকৃত নাস্তাটাই খেতেন; কিন্তু খেতেন মাদরাসায় নিয়ে এসে এবং কয়েকজন উস্তাদকে সঙ্গে নিয়ে। জামি'আর যে কোন সমস্যার সমাধানে যখন তার প্রয়োজন হত তখন তিনি তার পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসতেন।

ভাড়ায় গৃহীত জামি'আর টিনশেড ঘরগুলোর অ্যাকোয়ারকৃত অর্ধেকাংশ যখন সড়ক ও জনপথ কর্তৃপক্ষ ভেঙ্গে রাস্তায় শামিল করে নেয়, তখন আদালত কর্তৃক অবশিষ্ট অংশের মালিক স্বীকৃত হন জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব। এরপর থেকে এ অংশ সম্পূর্ণ বিনা ভাড়ায় জামি'আকে ব্যবহার করতে দেন। কখনো নিয়ম রক্ষার্থে ভাড়া নিলেও সে টাকাও পুনরায় জামি'আর কোন কাজে ব্যয় করে দিতেন।

তার মনের আশা ছিল এবং শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর সুযোগ্য পুত্র হযরতুল আল্লাম তালহা কান্ধলবী সাহেব দা.বা. এর জামি'আয় উপস্থিতকালে হযরতের সম্মুখে তিনি সে আশা মজমার মধ্যে ব্যক্তও করেছিলেন যে, টিনশেডের জায়গাটি ব্যাংকের দায়বদ্ধতা মুক্ত হলে তিনি জামি'আর জন্য ওয়াকফ করে দিবেন। তার এ আশা যখন পূর্ণ হবে তখন নিশ্চয় এটা তার ও তার বংশের জন্য বিরাট সদকায়ে জারিয়া হবে ইনশা-আল্লাহ।

বৃহৎ পরিসরে জামি'আর কার্যাদি আঞ্জাম দেয়ার জন্য যখন নিকটস্থ কোথাও জমি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হল, তখনও মরহুম নিজের একটি জায়গা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে জামি'আকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিজীবি গোরস্তানের জন্য সরকার কর্তৃক যখন সে জমির অ্যাকোয়ারের সিদ্ধান্ত হল, তখন সে চাওয়া আর পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর তারই সুযোগ্য সন্তান বড় পুত্র মোহাম্মাদ কামরুজ্জামান বেলাল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত স্বপ্নধারা হাউজিংয়ে জমি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। এক্ষেত্রে জামি'আর এ মহৎ কাজে পিতার মত পুত্রও তার সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। বিশেষ হিকমতে নতুন স্থানে জামি'আর জমি সংগ্রহ ও ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয় জামি'আর আধ্যাত্মিক রাহবার মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক রহ. এর নামানুসারে 'জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া' নামে। প্রথমে দৃষ্টিনন্দন সুবিশাল মসজিদ নির্মিত হয় 'মসজিদুল আবরার' নামে। অতঃপর শুরু হয় 'কাসরুল আশরাফ' নামে বিশাল আয়তনে দশতলা শিক্ষা ভবনের নির্মাণ কাজ। মসজিদ মাদরাসার নির্মাণকাজ তদারকির মূল দায়িত্ব ছিল আলোচিত মরহুম হাজী সাহেবের উপর। এ পর্যায়ে মরহুম প্রায় সময় অসুস্থ থাকতেন। এতদসত্ত্বেও একটু সুস্থতা অনুভব করলেই ছুটে গিয়ে কাজের তদারকি করতেন। আর শারীরিক কারণে যেতে না পারলে ঘরে বসেই খোঁজ-খবর

নিতেন। অর্থ সঙ্কটের কারণে নির্মাণকাজ আটকে গেলে বাহ্যিক ক্ষেত্রে শেষ ভরসা হতেন তিনি। জামি'আতুল আবরারের ভালোবাসায় তালিবে ইলমদের রচিত তারানা 'শূন্য থেকেই হবে, অনেক বড় হবে, সবার মাঝে এই জামি'আ স্মরণীয় রবে' এর প্রথম বাক্যটি তিনি সংশোধন করে বলতেন, 'আল্লাহ থেকেই হবে, অনেক বড় হবে...'।

জামি'আ পরিচালনা কমিটির দ্বিতীয় সভাপতি জনাব আলহাজ্জ আব্দুল মতিন সাহেবের ইন্তিকালের পর পরিচালনা পরিষদের এক সভায় মরহুম হাজী মোহাম্মাদ আলী সাহেবকে সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীতে এ প্রস্তাব বিবেচনার অধিবেশনে সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ আহমাদ ফজলুর রহমানকে সভাপতি মনোনীত করে মরহুম হাজী সাহেবকে তার পূর্ববর্তী পদেই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রেক্ষিতে কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলেন যে, এতে মরহুম হাজী সাহেব কিছুটা হলেও মনক্ষুণ্ন হবেন। কিন্তু সব আশঙ্কাকারীর আশঙ্কাকে তিনি অবাস্তব প্রমাণিত করেছেন। এ সিদ্ধান্তের বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। পক্ষান্তরে এ প্রেক্ষিতে তিনি যে উক্তি করেছিলেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। তিনি বলেছিলেন, 'সভাপতির পদ কেন যদি সকল পদ থেকে বিদায় করে দিয়ে জামি'আয় আসতেও নিষেধ করে দেয়া হয়, তারপরও আমি জামি'আকে ছাড়বো না। দরজা দিয়ে ঢুকতে না দিলে জানালা দিয়ে হলেও উঁকি মেরে দেখবো যে, জামি'আর ছাত্র-উস্তাদগণ কেমন আছেন'।

এমন দরদী অভিভাবক হারিয়ে জামি'আর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই শোকাহত ও অশ্রুসিক্ত। জামি'আর প্রতিটি ইটের মধ্যে রয়েছে তার প্রতিচ্ছবি। যতদিন জামি'আ যিন্দা থাকবে ইনশা-আল্লাহ তিনি সওয়াব পেতে থাকবেন।

নবীগণ ছাড়া সকল মানুষের মধ্যে দোষ-গুণ দুটোই থাকে। মরহুমও তার উর্ধ্বে নন। কিন্তু তার গুণের সামনে দোষগুলো ম্লান হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তার অশেষ মেহেরবানীতে মরহুমের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিন। তার সকল নেক কাজের অতিউত্তম বিনিময় দান করুন। জামি'আর জন্য তার উত্তম বিকল্প দান করুন। তার উত্তরাধিকারীদেরকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। সেই সঙ্গে জামি'আর সকল হিতাকাঙ্ক্ষী, বিভিন্ন পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে যারা তার পূর্বেই পরকালে চলে গেছেন তাদের সকলকে জামি'আর উসিলায় জান্নাত নসীব করুন। আর যারা বেঁচে আছেন তাদের সকলকে বরকতময় হায়াত দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

লেখক : নায়েবে মুফতী,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

(২৮ পৃষ্ঠার পর; মুহাদ্দিসীনের মাযহাব)

এটা বড় বড় মুহাদ্দিসগণও উপলব্ধি করতেন। পাঠকের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইমাম ইবনে ওয়াহাব রহ. এর ঘটনা তুলে ধরবো যিনি ছিলেন লক্ষাধিক হাদীসের হাফেয। তিনি বলেন, মালেক ইবনে আনাস ও লাইস ইবনে সা'আদ যদি না হতেন আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমার ধারণা ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবকিছু সকলের জন্য সর্বাবস্থায় আমলযোগ্য। (তারীখু দিমাশক ৫/৩৫৯)[১০]

অর্থাৎ তিনি মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস তো শিখেছিলেন, কিন্তু হাদীসের ওপর আমল কিভাবে করা হবে সে নীতিমালা জানা না থাকায় বিরোধপূর্ণ হাদীস ও হাদীসের মর্মের ভিন্নতা ইত্যাদি তাকে অস্থির করে তুলছিল। যখন মালেক ইবনে আনাস ও লাইস ইবনে সা'আদ এ দু'জন শ্রেষ্ঠ ফকীহের সংশ্রবে এলেন এবং কোন হাদীস আমলযোগ্য তার জ্ঞান লাভ করলেন এবং বিরোধপূর্ণ হাদীসের ক্ষেত্রে কোন হাদীস অগ্রাধিকারযোগ্য তা অবহিত হলেন, সেই সাথে কোন হাদীসের উপর আমল রহিত হয়ে গেছে বিষয়গুলো জানলেন তখন তার মন প্রশান্ত হল। অপর একটি বর্ণনায় তার অভিব্যক্তি আরো পরিষ্কারভাবে এসেছে,

আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে মালেক ও লাইসের মাধ্যমে উদ্ধার না করতেন আমি গোমরাহ হয়ে যেতাম। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তা কীভাবে? তিনি বললেন, আমি প্রচুর হাদীস সংগ্রহ করেছিলাম, এ হাদীস আমাকে দিশেহারা করে দিল। পরে আমি এসব মালেক ও লাইসের সামনে উত্থাপন করলাম। তারা বললেন, এটা গ্রহণ করো আর এটা ছেড়ে দাও। (তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক ৩/২৩৬)[১১]

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইবনুল মুবারক রহ.ও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

لولا ان الله اعانني بابى حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس.

অর্থ : যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মাধ্যমে সাহায্য না করতেন আমি অন্যান্য (হাদীস বর্ণনাকারী) লোকদের মতই হতাম। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৪৮৪)

অর্থাৎ হাদীসের পরস্পর বিরোধ ও রেওয়ায়াতের ভিন্নতার কারণে একজন বর্ণনাকারী যে হায়রাত ও অস্থিরতার সম্মুখীন হয় আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাকে এর থেকে রক্ষা করেছেন। এই দুই ফকীহ তাকে এমন হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য সাধন এবং কোন হাদীসের উপর কোনটি প্রাধান্য পাবে তা শিখিয়েছেন। স্মর্তব্য যে, আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী ছিলেন কালজয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ। ইবনুল মুবারকের মত মুহাদ্দিসও ফিকহের জন্য তাদের সংশ্রব গ্রহণ করেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন।

উপরোক্ত কারণেই যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ ফকীহদের শরণাপন্ন হয়েছেন। তারা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, তা সত্ত্বেও ফিকহী সমাধান ফকীহদের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দিয়েছেন। শাখাগত বিষয়ে অর্থাৎ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাদের মাযহাব অনুযায়ী আমল করেছেন। মহান চার ইমামের কারো ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়ে তা গ্রহণ করেছেন এবং ফতওয়া দিয়েছেন। আমরা নিম্নে এ রকম যুগশ্রেষ্ঠ কয়েকজন মুহাদ্দিস মনীষীর পরিচয় ও মাযহাব তুলে ধরব যারা ইসলামের ইতিহাসে হাদীস ও ইলমে হাদীসে সম্রাট হিসেবে গণ্য। (চলবে, ইনশাআল্লাহ।)

লেখক : মুদাররিস, জামি'আ বাইতুল আমান
মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল
রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

---

১০. তার নির্বাচিত শব্দ-
لولا مالك بن انس وليث بن سعد لهلكت كنت اظن ان كل ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم يعمل به.

১১. لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت فقيل له كيف ذلك؟ فقال أكثرت من الحديث فحيرني فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان خذ هذا ودع هذا. (الديباج المذهب ١/٧٤)

গ্রন্থ পরিচিতি

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর দু'আর ভাণ্ডার

মুনাজাতে মাকবূল

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি। এজন্য মানুষ তার কাজ-কর্ম সম্পাদনে এবং নানাবিধ প্রয়োজনে অন্যের দ্বারস্থ হয়। তবে মুমিন বান্দারা তাদের সকল কর্ম সম্পাদনে এবং নিজেদের সকল প্রয়োজন পূরণে কেবল আল্লাহ তা'আলার দরবারেই হাত পাতবে, তারই কাছে দু'আ করবে। কারণ মানুষের সকল প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কাছে রোনাযারী ও দু'আর মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। দু'আকারী যেন আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলে, তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে আর্জি পেশ করে। বস্তুত তিনিই মানুষের সকল কষ্ট লাঘব করতে পারেন এবং তার যাবতীয় সমস্যা দূরীভূত করতে পারেন। কারণ তিনি সবকিছুরই উপর ক্ষমতাবান, তার উপর কারও কোন ক্ষমতা নেই।

দু'আ ঈমানদারের বিরাট হাতিয়ার। কোন কোন দু'আ মানুষের ভাগ্য পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিতে পারে, যা অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব নয়। দু'আ ইবাদতের সারবত্তা। মুমিনের দু'আ কবুলে বিলম্ব হতে পারে কিন্তু বিফল কখনো হয় না। এজন্য সকল ক্ষেত্রে দু'আই ঈমানদারের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ অবলম্বন এবং সব পরিকল্পনা ও সকল কর্মের ভিত্তি হওয়া উচিত।

একজন খাঁটি মুমিন সমস্ত কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার কাছেই দু'আ করে; ফলে তিনি তাকে পরিস্থিতি সহজে সামলে নেয়ার তাওফীক দান করেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জনপদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন বিপদাপদে নিপতিত ছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এরা কেন আল্লাহর কাছে দু'আ করে না?'

সুতরাং আমরা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জন্যও তার কাছেই সাহায্য চাইব। আমাদের সব চেষ্টা-সাধনা কল্যাণপ্রসূ করার জন্যও তারই কাছে করুণা ভিক্ষা চাইব। কখনও অসুস্থ হলে নিশ্চিত জানব যে, তার সাহায্য ও ইচ্ছা ছাড়া একজন ভাল ডাক্তার মিলবে না। আবার তার হুকুম ছাড়া ভাল ডাক্তারও আমার রোগ নির্ণয় করতে পারবে না; এমনকি সর্বোত্তম চিকিৎসাও তার আদেশ ছাড়া ফলপ্রসূ হবে না। শুধু রোগ-ব্যাধিই নয় অন্যান্য বিপদ-আপদের বেলায়ও এটা সত্য। এজন্য ছোট-বড় সবকিছুর জন্যই আমাদের আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা উচিৎ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এক্ষেত্রে ছোট-বড়'র তারতম্য করেন না। কেননা আমাদের প্রার্থিত কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার কুদরতের মোকাবেলায় বড় নয়। আবার আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে প্রাপ্ত কোন কিছুই বান্দার জন্য 'ছোট' কিংবা তুচ্ছ নয়। তাই সামান্য জুতার ফিতার জন্যও আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে বলা হয়েছে। ভিক্ষুক ও অসহায়ের মত চাইতে বলা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহর তুলনায় আমাদের অবস্থান এমনই নগণ্য। তবে কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা নিয়ে দু'আ করতে হবে। অমনোযোগী এবং কবুলিয়তে আস্থাহীন দু'আ কবুল হয় না। দিবেন কি দিবেন না বলে আমি আল্লাহকে সন্দেহ করব আর তা সত্ত্বেও আল্লাহ আমাকে প্রার্থিত বস্তু দিয়ে দিবেন; তা হয় না।

খাঁটি মনে দু'আকারী কখনও বঞ্চিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আমার কাছে দু'আ কর আমি কবুল করবো'। তবে কখনও তিনি দুনিয়াতেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি দান করেন, অথবা আখেরাতের জন্য এর প্রতিদান গচ্ছিত রাখেন, আবার কাঙ্ক্ষিত বস্তুর পরিবতে সমপর্যায়ের কোন অনিষ্টও দূর করে দেন। (মুসনাদে আহমাদ হা.নং. ১১১৩৩)

দু'আ আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সর্বোচ্চ মাধ্যম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট দু'আ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত আর কিছু নেই। (সুনানে তিরমিযী হা.নং. ৩৩৭০)।

তিনি আরো বলেন, দু'আই ইবাদত। (মুসনাদে আহমাদ হা.নং. ১৮৪১৫)। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করে না আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন, রাগ করেন। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং. ২২৩৮) মাওলানা মানযুর নো'মানী রহ. বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, কারণ তিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত ছিলেন। ... কেউ যদি শুধুমাত্র রাসূলের দু'আসমূহও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করে তাহলে সে সহজেই স্রষ্টার সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের ব্যাপারে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে পারবে।'

দু'আর এতো গুরুত্ব ও ফযীলত বিবেচনা করে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত 'দু'আর ভাণ্ডার' মানুষের দ্বারে দ্বারে, হাতে হাতে পৌঁছে দিতে যুগে যুগে রচিত হয়েছে শুধু দু'আ সংবলিত বহু স্বতন্ত্র পুস্তিকা। তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এই–

১. আদ-দু'আ, আল্লামা তাবারানী (৩৬০হি.)।
২. আদ-দু'আ, আল্লামা মাহামিলী (৩৩০হি.)।
৩. কিতাবুদ দু'আ, সদরুদ্দীন আল আসবাহানী (৫৭৬ হি.)।
৪. আত-তারগীব ফিদ-দু'আ, আব্দুল গনী মাকদিসী (৬০০হি.)।
৫. সিলাহুল মু'মিন ফিদ দু'আ, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইমাম (৭৪৫হি.)।
৬. আদ-দু'আ, আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ফুযাইল আয-যুব্বি (১৯৫হি.)।
৭. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলা, ইমাম নাসায়ী (৩০৩হি.)।
৮. আল-আযকার, ইমাম নববী (৬৭৬হি.)।

এছাড়াও আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-জাযারী রহ. (৭৫১-৮৩৩হি.) কর্তৃক সংকলিত আল-হিসনুল হাসীন (অলঙ্ঘ্য দুর্গ) একটি উল্লেখযোগ্য কিতাব, যা কুরআন-হাদীস এবং ফিকহের আলোকে রচিত খুবই প্রসিদ্ধ। কিতাবটি ৭৯১ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সংকলন করা হয়েছিল, যখন ইসলামের শত্রুরা দামেশক শহর অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। সংকলক কর্তৃক এ কিতাবের দু'আসমূহ কিছুদিন নিয়মিত পড়ার পর শত্রুবাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অবরোধ তুলে পালিয়ে যায়। এ-ই কারণ যে, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে এই কিতাবের দু'আসমূহ পড়ার বিষয়টি ব্যাপক

পরিচিতি লাভ করেছে। আল-হিসনুল হাসীন কিতাবের দু'আগুলো সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে লেখা হয়েছে। সপ্তাহের ৭দিনের প্রতিদিন আমল করার সহজ উপায় হিসেবে এটা করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪হি.) আল্লামা জাযারীর কিতাবের আঙ্গিকে দৈনন্দিন আমল করার জন্য 'আল-হিযবুল আ'যম' সংকলন করেন। আল্লামা ইবনুল জাযারী রহ.-এর আল-হিসনুল হাসীন ও মোল্লা আলী কারী রহ.-এর আল হিজবুল আ'যম-এর আদলে রচিত আরেকটি দু'আ ও মুনাজাতের মকবুল কিতাব 'মুনাজাতে মাকবূল'। আজ আমরা 'মুনাজাতে মাকবূল'-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করবো।

লেখক পরিচিত :

বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ এ কিতাবটি সংকলন করিয়েছেন হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, ইমামে তরীকত, শাইখুল-মাশাইখ, কুতুবুল-ইরশাদ, ওলীয়ে-কামেল এবং সহস্রাধিক গ্রন্থের রচয়িতা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. (১২৮০-১৩৬২হি.)। সাধারণভাবে তিনি হাকীমুল উম্মত (উম্মতের চিকিৎসক) নামেই অধিক পরিচিত। তিনি বিংশ শতাব্দির একজন বিজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইসলামের সকল শাখায় যেমন- কুরআন, হাদীস, ফিকহ এবং ইলমে তাসাওউফে তার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তিনি এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক কিতাব রচনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তার সম্পর্কে লিখেছেন, 'তাঁর মত এরকম একজন সফল ইসলামী ব্যক্তিত্ব বিগত কয়েক শতাব্দিতেও পাওয়া যায় না।' (বিস্তারিত জানতে 'আশরাফ চরিত' দ্রষ্টব্য)

বিষয়-বিন্যাস :

কিতাবটি 'মুনাজাতে মাকবূল' নামে পরিচিত হলেও এর মূল আরবী নাম قربات عند الله وصلوات الرسول (কুরুবাতুন ইনদাল্লাহি ওয়া সালাওয়াতুর রাসূল)। মুহতারাম লেখক এই কিতাবে ২০৬টি দু'আ সংকলন করেছেন, যার ৪০টি কুরআনে কারীম থেকে নেওয়া আর বাকীগুলো প্রায় সবই হাদীসে রাসূল থেকে নেওয়া।

নিয়মিত সহজপাঠ্য করার জন্য দু'আগুলোকে তিনি সপ্তাহের সাতদিন হিসেবে সাত মন্যিলে ভাগ করেছেন। প্রথম মনযিলের আগে একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ খুতবা পেশ করেছেন। প্রথম মনযিল শনিবার, দ্বিতীয় মনযিল রবিবার, তৃতীয় মনযিল সোমবার, চতুর্থ মনযিল মঙ্গলবার, পঞ্চম মনযিল বুধবার, ষষ্ঠ মনযিল বৃহস্পতিবার এবং সপ্তম মনযিল শুক্রবারে পড়তে হয়। প্রথম মনযিলে কুরআনে কারীমের ৪০টি দু'আ ও হাদীসে বর্ণিত ১৪টি দু'আ, মোট ৫৪টি দু'আ সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় মনযিলে ৩১টি, তৃতীয় মনযিলে ৩১টি, চতুর্থ মনযিলে ৩৪টি, পঞ্চম মনযিলে ২৪টি, ষষ্ঠ মনযিলে ১৬টি এবং সপ্তম মনজিলে ১৬টি এভাবে মোট ২০৬টি দু'আ এই কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

মুনাজাতে মাকবূল সমগ্রতে যে সব বিষয় হযরত থানবী রহ.-এর নিজস্ব রচিত বা তার পক্ষ হতে অনুমোদিত সেগুলো এই–

১. আরবী সাত মানযিলের উর্দু কাব্যানুবাদ।

২. আল্লামা রূমী রহ. রচিত মসনবী শরীফ থেকে নির্বাচিত ফার্সী কাব্যের দু'আসমূহের সাত মনযিল।

৩. হিযবুল বাহ্‌র। তবে হিযবুল বাহ্‌র-এর শুরুতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এটা মাসূর অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত নয়। সেসঙ্গে এর আমলের সীমারেখাও চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে।

আরবী মুনাজাতে মাকবূল এবং উপর্যুক্ত তিনটি বিষয় ছাড়া অন্য যা কিছু বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মুনাজাতে মাকবুলের সঙ্গে যুক্ত করে ছেপেছে তা হযরত থানবী রহ.-এর সংকলন নয়। বলাবাহুল্য হযরত থানবীর অনুমোদন বহির্ভূত ওইসব অতিরিক্ত সংযোজনের যথার্থতা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামকে দেখিয়ে যাচাই করে নেয়া জরুরী। অনেকের ধারণা, মুনাজাতে মাকবুলের সঙ্গে যা কিছুই ছাপা হয়ে থাকে তার সবটাই হযরত থানবী রহ.-এর সংকলন বা তার পক্ষ হতে অনুমোদিত। বিষয়টি এমন নয়। আসলে সংকলনটি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হওয়ায় অনেক প্রকাশকই এটি ছাপিয়ে থাকেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, কোন কোনো প্রকাশক এতে এমন অনেক অযীফাও সংযুক্ত করে দিয়েছে, যা হাদীসের বর্ণনা তো নয়ই এমনকি অর্থ ও মর্মের দিক থেকেও আপত্তিকর।

বৈশিষ্ট্যাবলী :

মুনাজাতে মাকবুলের প্রায় সকল দু'আই যেহেতু কুরআন-হাদীস থেকে নেয়া অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে দু'আ ও মিনতি করার আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক শেখানো শব্দ-বাক্য, তাই এ দু'আগুলো যে আল্লাহ তা'আলার কত প্রিয় ও পছন্দনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এ দু'আগুলো যে বিফলে যাবে না তাও নিশ্চিত করেই বলা যায়।

কুরআন মাজীদে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবী-অলীগণের হৃদয়স্পর্শী দু'আ, বিশেষ বিশেষ অবস্থার তুলনাহীন কাকুতি-মিনতি, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতাপ, মহিমা ও ওহীর আলোকচ্ছটায় ঝলমলে প্রার্থনারাজি– এ যেন ধূলির ধরায় জান্নাতী আলোর ঝর্নাধারা, এ যেন আসমান-যমীনের যিনি নূর তাঁর সঙ্গে মাটির মানুষের আলোক-বন্ধন।

অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক দু'আগুলোতে যে নূর ও আলো, যে সজীবতা ও প্রাণময়তা, আল্লাহর প্রতি বান্দার সমর্পণের যে উদাহরণ ও নমুনা, মালিকের সান্নিধ্য ও নৈকট্যের যে অনুভব-অনুভূতি জীবন্ত হয়ে আছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, শুধু উপলব্ধি ও অনুমান করা যায়।

আলহামদুলিল্লাহ! কিতাবটি দু'আর ক্ষেত্রে এতোটাই সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ যে, পাঠক বলতে বাধ্য হবেন– 'আশ্চর্য! এখানে তো দীন-দুনিয়ার কোন কিছুই বাদ রাখা হয়নি!!'

কয়েক বছর আগে প্রিয় উস্তায মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেবকে (মুহাদ্দিস, দড়াটানা মাদরাসা, যশোর) পকেটে রাখা যায় এমন একটি 'মুনাজাতে মাকবূল' হাদিয়া পেশ করি। এর দুই বছর পর হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে বললেন, 'আব্দুর রায্‌যাক! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জাযায়ে খায়ের নসীব করুন। তোমার দেয়া পকেট সাইজের মুনাজাতে মকবুলটিই ছিল আমার বাইতুল্লাহ সফরে শ্রেষ্ঠ পাথেয় একান্ত সঙ্গী। সুযোগ হলেই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মাওলা পাকের দরবারে মুনাজাতে মাকবুলের দু'আগুলোই বেশী বেশী পড়তাম। নূরে ঝলমল এ দু'আগুলোর পরশে আমার গোটা সফরটাই ছিল নূরে উজালা।

ভাষান্তর :

গ্রন্থটিকে আল্লাহ তা'আলা এতটাই মকবূলিয়্যাত দান করেছেন যে, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলাসহ পৃথিবীর বহু ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। এটির প্রথম উর্দু অনুবাদক হযরত থানবী রহ.-এর খাছ ও মকবুল খলীফা হাকীম মুহাম্মাদ মুস্‌তাফা বিজনূরী রহ.। এছাড়াও অনেকে এটির উর্দু অনুবাদ করেছেন।

(৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-১৮

অসহায় এক নারীর করুণ কাহিনী। জন্মসূত্রে অমুসলিম ছিলেন। বাড়ি উত্তরবঙ্গে। হাইস্কুলে পড়ার সময় মুসলমান ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যেই ধর্ম বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো। এভাবে একপর্যায়ে নিজ বিশ্বাসের প্রতি যতই যুক্তি খোঁজেন ততই যেন অযৌক্তিক মনে হয়। বিপরীতে তখনকার ওই ক্ষুদ্রজ্ঞানে ইসলাম ধর্মই যেন যৌক্তিক ধর্ম মনে হয়। ধীরে ধীরে তার ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এই পরিবর্তনের প্রভাব তার আচার-আচরণেও পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম ধর্ম শেখার জন্য এবং বিস্তারিত জানার জন্য এখন সে ভিন্নভাবে সময় ব্যয় করে।

পরিবারের লোকেরা প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব দিত না। কিন্তু যখন দেখল যে, সে রীতিমত কিছু ইসলাম চর্চা শুরু করে দিয়েছে তখন তাদের কানে পানি গড়ায়। তারা প্রথমে নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং সে সময়ে তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে যে, সে মূলত তাদের চোখ ফাঁকি দিচ্ছে, নাকি তাদের কল্পিত উপাস্যদের উপসনা করছে? এভাবে যখন নিশ্চিত হল যে, সে আসলে তাদের চোখে ধুলা দিতে চেষ্টা করছে তখন শুরু করল অত্যাচার। অথচ 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এটা তাদেরই শ্লোগান। বাস্তবে তাদের এ শ্লোগান হল, হাতির ঐ দাঁত, যা শুধু দেখানোর জন্য; ব্যবহারের জন্য নয়।

মেয়েটা এ বাস্তবতা এতদিন পরে অনুভব করল। অবস্থা বেগতিক দেখে সে বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু মেয়ে মানুষ কোথায় যাবে! কার সাথে যাবে? কীভাবে যাবে? এসব প্রশ্নের কোন জবাব তার কাছে নেই।

এদিকে তার এ পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এ জুলুম-নির্যাতন এখন এলাকাবাসীর আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে তার এক সহপাঠীর মনে কিছু করুণা হল। ছেলেটি ইতোমধ্যে ঢাকার উত্তরায় একটি কলেজে পড়ালেখা করে। সে অন্যান্য মুসলমান ছেলেদের তুলনায় একটু বেশি ধর্মপরায়ণও বটে। সে নিজ থেকে অগ্রসর হয়ে মেয়েটির খোঁজ-খবর নিতে লাগল। মেয়েটা তাকে বিপদের বন্ধু ভেবে বাড়ি ছাড়ার কাজে তাকে সহায়তার আবেদন জানাল।

সিদ্ধান্ত হল, মেয়েটা ঢাকায় এসে কোন ছাত্রী হোস্টেলে উঠবে এবং দেখেশুনে কোন কলেজে ভর্তি হবে। ছেলেটা তাকে যতটুকু সম্ভব আর্থিক সহযোগিতা করবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুযোগ বুঝে একদিন সংক্ষিপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে মেয়েটি সোজা ঢাকায় চলে আসে এবং উত্তরায় কোন এক ভাড়া করা হোস্টেলে মেস-মেম্বার হিসেবে যোগদান করে। খরচের যোগান দেয়া কঠিন হবে, আবার পরিপূর্ণ ইসলাম মেনে চলা অসম্ভব হবে– এ জাতীয় সমস্যার কথা চিন্তা করে সে মনস্থির করল যে, কোন কলেজে ভর্তি হবে না; টিউশনী করবে। এতে যা উপার্জন হবে তা দিয়ে থাকা-খাওয়ার খরচ চালাবে। আর দীনী বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিকটস্থ তা'লীমের পয়েন্টে অংশগ্রহণ করবে। এভাবেই শুরু হল তার একক জীবনযাত্রা।

ছেলেটা একসময় তার সহায়ক ও পথপ্রদর্শক হলেও এখন আরো ঘনিষ্ঠ। বলতে গেলে একমাত্র অভিভাবক। সে রীতিমত তার খোঁজ-খবর নেয়, পরামর্শ দেয়। সে নিজেও দীনদারীর ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অনেক অগ্রসর। উভয়েই বুঝতে পারছিল যে, শত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তারা শেষ পর্যন্ত বেগানা নারী-পুরুষ। এরপরও ছেলেটা যেমন মেয়েটাকে একা ছাড়তে পারছিল না, মেয়েটাও ছেলেটার উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারছিল না।

ছেলেটা প্রায়ই বলত, একটা ছেলে দেখে তোমাকে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিই। কিন্তু মেয়েটি এই ছেলেকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে কল্পনাও করতে পারছে না। সে বলতো, কেন, আমরা কি ভবিষ্যতে একসঙ্গে থাকতে পারি না? ছেলে বলতো, আমার পরিবার তো কোনভাবেই এটা মেনে নিবে না! বেশির চে' বেশি আমরা সাময়িক সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারি, যেন গুনাহমুক্ত থাকতে পারি। শর্ত হল, এলাকার কেউ যেন জানতে না পারে এবং আমি যখনই তোমার জন্য পছন্দসই কোন ছেলে পাবো, তার সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিবো। মেয়ে শর্তদ্বয় মেনে নিয়ে তার সঙ্গে বিবাহে রাজি হয়ে গেল। খুব সংক্ষিপ্ত আসরে বিয়ে হল। অতঃপর তারা মেস ছেড়ে একটা ছোট্ট বাসা ভাড়া নিল।

শুরু হল জীবনের তৃতীয় পর্ব। নিজের আয়েই নিজের সংসার; স্বামীর কোন দায় নেই। স্বামী রীতিমত এ বাসায় থাকে না। মাঝে-মধ্যে আসে, খুব কম সময় থাকে আর উপযুক্ত ছেলে পাওয়া গেলে তার সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিবে কথাটি প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু যত দিন যায় স্বামীর এ কথা তার মনে বর্শার চেয়ে কঠিনভাবে আঘাত হানে। এ শর্ত মেনেই বিয়ে করেছে বলে প্রতিবাদ করার যুক্তিও তার কাছে নেই। এ আরেক বিপদ ও দহন-যন্ত্রণা, যা বোঝার মত তার কোন আপনজন এ ধরাতে নেই। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে লাগল, যেন তাকে একটা সন্তান দান করেন, তাহলে হয়তোবা সন্তানের মুখ চেয়ে হলেও সে তাকে স্থায়ীভাবে মেনে নিবে। এ চিন্তায় সে এখন সব সতর্কতা পরিহার করে চলে।

আল্লাহর কি মর্জি! দেখতে না দেখতে সে মাতৃত্বের লক্ষণ অনুভব করে। একপর্যায়ে স্বামীও সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে সে যা আশা করছিল তা পূরণ হল না। স্বামী তার অবস্থানে অনড়। সে বলে, আমি কখনো এ বিয়ের কথা নিজের কারো কাছে প্রকাশ করতে পারব না। কাজেই তোমাকে অন্য কারো সাথে বিয়ে

করতেই হবে। এ জাতীয় কথা বলে আর আসা-যাওয়া পূর্বের তুলনায় কমিয়ে দেয়।

ইতোমধ্যে তার কোলে ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তানের আগমন ঘটে। ঠিক যেন বাপের ফটোকপি। মা ভেবেছিল, পুত্রের চেহারা দেখে সে ভুলে যাবে দুনিয়ার সব দুঃখ-যন্ত্রণা। কিন্তু না! পুত্রের মুখের দিকে তাকালেই দুঃখে তার কলিজাসহ বেরিয়ে আসতে চায়। এত জোরে চিৎকার করে কাঁদতে মনে চায়, যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে তার জীবন্ত কবর হয়ে যায়।

একবার ভাবে, আদালতে মামলা করবে। কিন্তু কোন ডকুমেন্ট তো নেই। আবার ভাবে স্বামীর বাবা-মাকে জানিয়ে দিবে কিংবা সন্তান নিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে উঠবে। কিন্তু আসলে তো সে একজন পলাতক। নিজ বাড়িতে গেলে মার খাবে ধর্মান্তরিত বলে। আর শ্বশুর বাড়িতে গেলে বের করে দিবে অশূচি বলে। এ অবস্থায় তার করণীয় কী এটা জানার জন্য সে ব্যাকুল। ইসলাম মুক্তির ধর্ম এটা তার বদ্ধমূল বিশ্বাস। কিন্তু তার মুক্তি কোন পথে! সে পথের সন্ধানে সে কোন একজনের কাছ থেকে আমার মোবাইল নম্বরটি সংগ্রহ করে কল দেয়। রিসিভ করে আমি যখন সালাম দিলাম তখন তার প্রথম কথাই ছিল, হুযূর! আমি একজন অসহায় মহিলা! আমি বললাম, কেন? ছোট্ট এ 'কেন?'র জবাবে সে তার অতীত জীবনের এই দাস্তান শুনিয়ে দিল টেপরেকর্ডের মত। এরপর জানতে চাইল, সে কেন অসহায় হল? আল্লাহ তা'আলা কি তাহলে তার প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট? আমি বললাম, বাস্তবে কে অসহায় আর কে সসহায় এর ফয়সালা হবে পরকালে। দুনিয়া পরীক্ষাগার। পরীক্ষার ধরন অনুপাতে সাফল্যের মান নির্ধারিত হয়। দুনিয়ার জীবনে ধৈর্য ও দৃঢ়তার মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে পরকালে এর চড়া মূল্য পাওয়া যাবে। সুতরাং ঈমানদারের জন্য দুনিয়ার দুঃখ-দুর্দশা কোন মুখ্য বিষয় নয়। এ জাতীয় কিছু সান্ত্বনার কথায় মহিলাটি যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে উঠল। পরে জিজ্ঞেস করল, এখন আমাদের এ সংসার জীবন শরীয়তমতে ঠিক হয়েছে কি না? আমি বললাম, এতটুকু ঠিক যে, নাজায়েয হয়নি। কিন্তু ইসলামী শরীয়তমতে ছেলে-মেয়ের গোপন বিবাহ পছন্দনীয় নয়। আপনাদের এ গোপন বিবাহ উচিত হয়নি। ছেলের উচিত ছিল বাবা-মাকে বুঝিয়ে তাদের সম্মতিতে আপনাকে বিবাহ করা। আর সে যখন তা করেনি, আপনার উচিত ছিল তার সঙ্গে বিবাহ না করে তার সহায়তায় অভিভাবকসংশ্লিষ্ট কোন ছেলের সঙ্গে বিবাহে আগ্রহী হওয়া। এটুকু ছিল বান্দার দায়িত্ব। বাকি যা হয়েছে সবই তাকদীরের বিষয়। হয়তো এর কারণে যে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন তার ফলে পরকালে অনেক বেশি পুরস্কৃত হবেন।

সে জিজ্ঞেস করল, এখন আমার কী করলে ভালো হবে? আমি বললাম, আপনি তাকে খোলামেলা জিজ্ঞেস করুন যে, সে আপনাকে নিয়ে লুকোচুরি না খেলে তার বাবা-মাকে জানিয়ে আপনার সঙ্গে সংসার করতে রাজি কি না? যদি রাজি হয় তাহলে আপনার উপস্থিতিতেই তার বাবা-মাকে পুরো ঘটনা জানিয়ে দিতে অনুরোধ করুন। তাতে যদি সে রাজি না হয়, তাহলে শরীয়ত মতে আপনাকে ছেড়ে দিতে বলুন। যদিও প্রস্তাবটি আপনার জন্য খুবই পীড়াদায়ক; কিন্তু এর ফল ভালো হবে। দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোকের আশায় ঝুলে থাকা নিরাপদ নয়। ভবিষ্যতে সে যদি লাপাত্তা হয়ে যায় তখন তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে পড়বে। কেননা আপনাদের বিবাহের কাবিনপত্র কিছুই নেই। এরচে' ভালো হয়, সুযোগ থাকতে আপনি তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। ভবিষ্যতে যদি কোন হৃদয়বান দীনদার পুরুষের সন্ধান পান তখন তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে কোন বাধা থাকবে না। আর এ 'অতিথি পাখিটি'রও যদি বোধোদয় ঘটে তাহলে তার সঙ্গেও বিবাহ দোহরিয়ে নিতে পারবেন। সর্বাবস্থায় মনে রাখবেন, কোন অনানুষ্ঠানিক ও অনিবন্ধিত বিবাহে জড়াতে যাবেন না। এসব শোনার পর তিনি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দু'আ চেয়ে ইতি টানলেন। আর কখনো ফোন করেননি। ফলে তার বর্তমান অবস্থা জানাও সম্ভব হয়নি। আল্লাহ তাকে দীনের উপর মজবুতী দান করুন এবং চলার পথকে সহজ করুন। তার সন্তানকে মায়ের জন্য যোগ্য অভিভাবক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পুনশ্চ :

ঘটনাটির বিশ্লেষণ এভাবেও হতে পারে, এই নওমুসলিম মেয়েটির করুণ অবস্থা জানার পর তার দুর্দশার জন্য অনেকাংশে ছেলেটিকেই দায়ী মনে হয়। অসহায় মেয়েটিকে এতদূর সাহায্য করার পর যখন মেয়েটি তাকে আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল ভাবতে শুরু করলো তখন ছেলেটি হয়তো আরো আন্তরিক হয়ে মেয়েটির ভবিষ্যত নিজের দায়িত্বে তুলে নিতে পারতো। কিন্তু একটু ভালোভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, এক্ষেত্রে ছেলেটির অনীহার অন্যতম কারণ তার পরিবার এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, যা সে স্বীকারও করেছে। ছেলেটি নিজের সমাজ এবং পরিবারের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে মেয়েটিকে বিবাহ করে তার স্থায়ী অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিতে পারবে না। এক্ষেত্রে সমাজ এবং পরিবার তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের সমাজে অসহায়কে সাহায্য করারও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি এবং সীমারেখা (?) কীভাবে যেন নির্ধারিত করা আছে। সীমার ভেতরে থেকে কেউ অসহায়কে সাহায্য করলে সমাজ মেনে নেয়; কিন্তু 'সীমা'টি লঙ্ঘন করতে চাইলে –যত ভালো কাজই হোক না কেন– সমাজ আর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেয় না। অসহায় মেয়েটিকে সেই সীমার ভেতরে থেকে সাহায্য করার সৎসাহস ছেলেটির থাকলেও সীমা অতিক্রম করার সাধ্য তার নেই। এ পর্যায়ে এসে ছেলেটি হয়তো নিজেই অসহায়। কাজেই তার নির্লিপ্ততা ও দায়িত্বহীনতার জন্য তাকে দোষারোপ করার পাশাপাশি এটাও ভেবে দেখা দরকার, কেউ বিপদগ্রস্তের সাহায্যে প্রয়াসী হলে আমাদের সমাজ কেন অন্যায়ভাবে তার কল্যাণকাজে সীমারেখা টেনে দেয়? সমাজের তো উচিত ছিলো, বিপদের শুরুতেই সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেয়েটির সাহায্যকারী হওয়া এবং তাকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। সর্বোপরি মুসলিম সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই দায়িত্ব হলো, মিশনারী জাতি হিসেবে নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে আকৃষ্ট করা, অতঃপর ইসলামের ইনসাফপূর্ণ বিধান ও মুসলমানদের জীবনাচরণে আকৃষ্ট হয়ে যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাকে নিজের ভাই-বোনের মতো আপন করে সবটুকু হৃদ্যতা ও ভালোবাসা উজাড় করে দেয়া। এটাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছিলো, যা সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবনে বাস্তবায়িত করেছিলেন। আমাদের উচিত, প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সাহাবায়ে কেরামের মতো নিজেদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সর্বস্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসকল সুন্নাত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা। তাহলে আমাদের সমাজে পূর্ণাঙ্গ শান্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমরাও সাহাবায়ে কেরামের মতো শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

আবূ তামীম

আলোক মিনারে

হযরত মাওলানা মুফতী শহীদুল্লাহ দা.বা.

মাওলানা আব্দুল হান্নান

ফেনী শহরের পাঁচ কিলোমিটার পূর্বে কালিদাস পাহালিয়া নদীর তীর। পাশেই জামি'আ রশীদিয়ার অনিন্দ্যসুন্দর বিশাল ক্যাম্পাস। মাঠের পাশে আধুনিক স্থাপত্যে গড়ে ওঠা দৃষ্টিনন্দন ছাত্রাবাস আর সৌন্দর্যের প্রতীক আর-রশীদ জামে মসজিদ। চারপাশে বিচিত্র ফুলের সাজানো বাগান আর ফলফলাদির সারি সারি বৃক্ষ। প্রতিটি ভবন থেকে বের হয়েছে পিচঢালা ছোট পথ। একপাশে স্বচ্ছ জলাধার। অন্যপাশে শান্ত পাহালিয়া নদী। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের বর্ণিল সমাহার এখানে। বৃষ্টিভেজা গোলাবের চেয়েও বেশি সজীব অধিক প্রাণবন্ত।

রাতের রশীদিয়া বড়ই চমৎকার। ছাত্রাবাসের বেলকনি থেকে চোখে পড়ে আলো আঁধারির অপূর্ব পরিবেশ। সন্ধ্যা যখন মাটিতে নেমে আসে রশীদিয়া তখন হাজার হাজার কাকলিমুখর পাখির অভয়াশ্রম। সন্ধ্যা যত গাঢ় হয় কিচিরমিচিরও স্তিমিত হতে থাকে। একসময় প্রতিটি পাখি শাখায় শাখায় পাতার ছাউনিতে ঘুমিয়ে পড়ে একেবারেই হাতের নাগালে। ইচ্ছা করলেই ধরা যাবে। কিন্তুআজব ব্যাপার! জামি'আ রশীদিয়ার চার হাজার ছাত্র প্রত্যেকেই নিজের চেয়ে সেসব পাখিদের বেশি ভালোবাসে। আপন করে হৃদয়ের মমতা মিশিয়ে ওরা কৃত্রিম বাসাও বানিয়ে রাখে। পাখিরাও সে ভালোবাসায় তৃপ্ত, মুগ্ধ হয়। হঠাৎ কামরায় ঢুকে পড়া কোন ছোট্ট চড়ুইয়ের নিরাপত্তার খাতিরে...

বলছিলাম জীবন্ত রশীদিয়ার কথা। এতোক্ষণ যা বলেছি নিতান্তই কম বলেছি। অবশ্য আমরা অনেকেই সবিস্ময়ে উপভোগ করেছি রশীদিয়ার সে মনমোহিনী সৌন্দর্য। আবেগাপ্লুত হয়েছি রশীদিয়া কর্তৃপক্ষের নিরেট-নিখাঁদ আপ্যায়ন আন্তরিকতায়।

সে বর্ণনায় আজ আর যাচ্ছি না। আজকে আমরা তুলে ধরছি রশীদিয়ার স্বপ্নদ্রষ্টার কথা। যিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন আজকের এ রশীদিয়া। যার স্বপ্ন দেখা চিত্রটিই চিত্রিত হচ্ছে পরম সফলতায়। যাকে আমরা বলতে পারি রশীদিয়ার প্রাণপুরুষ ও রাহবার।

আমরা মুহতারাম মুফতী শহীদুল্লাহ দা.বা.-এর কথা বলছি আর তাকেই বলছি স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বপ্নদ্রষ্টা বলছি তারই একটি স্বপ্নের দরুণ, যা হতে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। সাহসী হয়ে এ মহান এদারার ভিত স্থাপন করেছেন এবং সম্মুখ পানে এগিয়ে নিচ্ছেন।

তিনি বলেন, আমার স্বপ্ন ছিলো, হৃদয়ের গহীনে বড় প্রত্যাশা ছিলো আকাবিরে আসলাফের নমুনায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো। প্রতিষ্ঠানটি হবে দীনের এক দুর্ভেদ্য দূর্গ, আসহাবে সুফ্ফার উৎকৃষ্ট নমুনা। কিন্তু কখনো মনে হয়নি আমার পক্ষে তা সম্ভব। একরাতের কথা। অন্য সব রাতের মতোই ঘুমিয়েছি। দেখি,

আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে ধানের জমিতে এক বিশাল জামাআতে নামায হচ্ছে। দু'চোখের সীমানা পেরিয়ে দূর অবধি মুসল্লীদের নূরানী কাফেলা। তাদের নূরে সবকিছু ঝলমল করছে। নামাযের প্রতিটি কাতার পরিপূর্ণ। কেন যেন কোথাও কোন জায়গা বাকি নেই।

সর্বশেষ কাতারে মাত্র একজন মুসল্লী দাঁড়াতে পারবে। আমি তড়িঘড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ছেন মনের সবটুকু মাধুরী মিশিয়ে। চারদিকে এক জান্নাতী আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হল এ সুর আমার চেনা দুনিয়ায় নয়; অচেনা উর্ধ্ব জগতের। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিলাওয়াত শুনছি। আমাকে বলা হলো, এই নামাযে ইমামতি করছেন দোজাহানের সরদার স্বয়ং রাসূলে কারীম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

স্বপ্নটি আমার প্রতিজ্ঞা পূরণে আমাকে দৃঢ় করে তুলল। আমার কর্ম উদ্দীপনা শতগুণে বাড়িয়ে দিল। এ স্বপ্ন আমার ভালোলাগা, আমার মহান প্রেরণা।

জন্ম ও শিক্ষাকাল

আজ হতে ৫৪ বছর আগের কথা। ৩ শাওয়াল ১৩৮৩ হিজরী, ১২ জুলাই ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ। ফেনী সদর থানার কালীদহ ইউনিয়নের মৌলবী বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন মহান এ কর্মবীর মানুষটি। পারিবারিক ঐতিহ্য বেশ সমীহ করার মতো। পিতা মৌলবী আলী আকবর রহ. সময়ের বড় বুযুর্গ ও নামিদামী আলেম ছিলেন। যামানার কুতুব সূফী সদরুদ্দীন রহ.-এর খেলাফতও তিনি লাভ করেছিলেন। দাদা-নানা উভয়ে ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার ও সম্মানী ব্যক্তিত্ব। মরহুমা আম্মাজান আমেনা খাতুনও ছিলেন একজন দীনদার পরহেযগার মহিলা। পারিবারিকভাবে দীনি ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত থাকায় মায়ের কোল থেকেই শিক্ষার সূচনা হয়। লস্করহাট ইসলামিয়া ও ভালুকিয়া কাসেমুল উলূম কওমী মাদরাসায় শুরু হয় তার শিক্ষা জীবনের আনুষ্ঠানিক সূচনা।

তারপর শুরু হয় দীন অর্জনের এক মহাযাত্রা। উলূমে দীনের ঐতিহ্যের ধারক চট্টগ্রামের মেখল হামিউস সুন্নাহ মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন দীর্ঘ ছয় বছর। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম দীনী বিদ্যাপীঠ জামি'আ আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে দাওরায়ে হাদীস সমাপন করেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আহসানুল ফাতাওয়ার সংকলক, মুফতিয়ে আ'যম রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ.-এর প্রতিষ্ঠিত দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদে ভর্তি হয়ে ইসলামী উচ্চতর আইন গবেষণায় উচ্চতর (মুফতী) ডিগ্রি অর্জন করেন। আর পাশাপাশি মুফতিয়ে আ'যম রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ.-এর সোহবতে থেকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে আরোহন করে খেলাফত লাভে ধন্য হন। যিনি বড় হোন তিনি ছোট থেকেই থাকেন অন্য সবার চেয়ে আলাদা। মুফতী শহীদুল্লাহ সাহেবও তেমনই ছিলেন। লেখাপড়ায় শুরু থেকেই অত্যন্ত মেধাবী, মনোযোগী এবং কঠোর পরিশ্রমী।

জায়গীর থেকে পড়েছেন মেখলের ছয়টি বছর। মাদরাসায় বহুদূর থেকে আসা-যাওয়া করতেন। তবে সময়ের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। জায়গীর বাড়িতে আসা-যাওয়ার পথেই গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ পুরোটা মুখস্থ করেছেন। বাড়িতে যাতায়াতের সময় গাড়ি আর ট্রেনে বসে ফয়যুল কালাম, হিদায়াতুল ইবাদসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছেন। পড়ালেখায় যেমন অনন্য ছিলেন বিনয়-নম্রতা, আখলাক-চরিত্রেও ছিলেন তেমনই ঈর্ষণীয়। আল্লাহ পাক তাকে অনন্য গুণের অধিকারী করেছেন।

বড়দের চোখে যেমন

হযরতের প্রিয় ছাত্র মুফতী ফয়যুল্লাহ। সুদর্শন প্রাজ্ঞ তরুণ আলেমে দীন। চেহারায় ইলম ও নম্রতার স্পষ্ট নিদর্শন।

হযরতের অনুপস্থিতিতে জামি'আ রশীদিয়ার সুযোগ্য দায়িত্বশীল। অন্যান্য উস্তাদগণের সহযোগিতায় তখন পরিচালনার সকল দিক অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। হযরত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাটহাজারী মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দিস বর্তমানে নানুপুর মাদরাসার শাইখুল হাদীস আল্লামা শেখ আহমাদ সাহেব একবার দরস চলাকালীন আমাকে বলছিলেন, ফয়যুল্লাহ! আমি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে হাটহাজারী মাদরাসায় খেদমত করছি। এ দীর্ঘ সময়ে মেধা, বুদ্ধি, পড়ালেখা ও আদব-আখলাকে নানা রকম ছাত্র পেয়েছি। তাদের একেকজনের একেক গুণ, একেকজন একেক বিষয়ে দক্ষ। কিন্তু তোমাদের ফেনীর শহীদুল্লাহর মতো আর কারও মধ্যে এই সব গুণের সমাবেশ দেখিনি। আল্লাহ্ পাক তাকে যেমন মেধা, প্রতিভা ও প্রজ্ঞা দান করেছেন; উন্নত চরিত্র, বিনয় ও নম্রতাও দান করেছেন মনে রাখার মতো।

ধন্য সেই ছাত্র, সার্থক তার জীবন– উস্তাদ যাকে এভাবে মূল্যায়ন করেন।

মুফতী ফয়যুল্লাহ সাহেব আরো বলেন, হযরতের সাথী মাওলানা যমীরুদ্দীন সাহেব আমাদেরকে একবার শুনিয়েছেন, মুফতী শহীদুল্লাহ সাহেবের ইলমী মাহারাত ও মুতালা'আর একসূয়ী (জ্ঞান-দক্ষতা ও অধ্যয়ন একাগ্রতা) আমরা সেই নাহবেমীর জামাআত (কওমী সিলেবাসের তৃতীয় ক্লাস) থেকেই উপলব্ধি করেছি। তখন আমরা মেখল মাদরাসায় নাহবেমীর পড়ি। মাওলানা আযীযুল্লাহ সাহেব রহ. বড় হুযূর ছিলেন আমাদের জামাআতের নেগরান (তত্ত্বাবধায়ক)। পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী নাহবেমীর এবং দু'বছর পরবর্তী কাফিয়া ক্লাসের মধ্যে মুবাহাসা (বিতর্ক অনুষ্ঠান)-এর ঘোষণা দেয়া হল। মুবাহাসার বিষয় নির্ধারণ হল, ইলমে নাহব বা আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র। ঘোষণার দিন থেকেই সবার মধ্যে একধরনের আনন্দ বিরাজ করছিল। সেই সাথে চলছিল ধুম প্রস্তুতিও। সাজসাজ রব পড়ে গিয়েছিল। আমাদের ছোটদেরও আগ্রহ-উত্তেজনার কমতি ছিলো না। আমরাও সাধ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন আমাদের পক্ষের সবচেয়ে মেধাবী, ক্লাসের 'ফার্স্টবয়' শহীদুল্লাহ ভাই অসুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেলেন। আমাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল। উস্তাদরাও চিন্তায় পড়ে গেলেন। সবাই আমরা দু'আ করছিলাম যেন শহীদুল্লাহ ভাই যথাসময়ে মাদরাসায় উপস্থিত হতে পারেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি মুবাহাসার আগ মুহূর্তে মাদরাসায় চলে এলেন। যথাসময়ে বিতর্ক শুরু হলো। কাফিয়া জামাআতের বড় ভাইয়েরা আমাদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন শহীদুল্লাহ ভাই। তারপর যখন আমাদের প্রশ্ন করার পর্ব এলো, শহীদুল্লাহ ভাই ওদেরকে এমন এমন প্রশ্ন করতে লাগলেন যে, ওরা বেশির ভাগ প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারল না।

উস্তাদগণ আমাদের বিজয়ী ঘোষণা করলেন। বড় হুযূর ভীষণ খুশি হলেন। সবাইকে বিশেষ দু'আ দিলেন। আর শহীদুল্লাহ ভাইকে বললেন, আজ তুমি আমার সম্মান রক্ষা করেছো, আল্লাহ তোমার সম্মান বৃদ্ধি করুন!

আমরা দেখতাম, তিনি সব সময় ক্লাসে প্রথম হতেন। উস্তাদের পাশাপাশি তিনি তার শাইখেরও খাস দু'আ পেয়েছিলেন। পাকিস্তানের হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ. একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় বলতেন, শহীদুল্লাহ কা তো উস দিন কাম বন গায়া (শহীদুল্লাহ তো সে দিনই কামিয়াব হয়ে গেছে) তিনি মাঝে মাঝে আরো বলতেন, মেরে শহীদুল্লাহ মুখবিতীন মে সে হ্যায় (আমার শহীদুল্লাহ বিনয়ীদের অন্তর্ভুক্ত)। এগুলো ছিলো একজন ছাত্রের প্রতি তার শাইখের মূল্যায়ন ও আন্তরিক স্নেহ-মায়া।

আসলে আল্লাহওয়ালাদের সোহবত মানুষকে যেমন অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয় তেমন তার মধ্যে এনে দেয় স্বভাবজাত উৎকর্ষ ও বিনয়। তিনি করাচিতে তার শাইখের সান্নিধ্যে আট বছর কাটিয়েছেন। শাইখ তাকে নিজ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের মর্যাদা দিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানে তিনি নিজেকে সবসময় খাদেমই মনে করতেন। জানতে পেরেছি, তিনি সেখানে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতার কাজ করতেন এমনকি যে দিন তিনি দেশে চলে আসবেন সেদিনও প্রতিদিনের ন্যায় দু'হাতে ময়লার বালতি নিয়ে গেটের বাইরে গিয়ে ডাস্টবিনে রেখে আসেন।

বড়দের দু'আ আর সোহবত পেলে মানুষের জীবনে এমনই পবিত্র রং আর নূরানিয়্যাত চলে আসে। আর তিনি সেই ছেলেবেলা থেকেই বড়দের দু'আ কুড়িয়েছেন। মেখল মাদরাসায় পড়াকালীন মুফতিয়ে আ'যম ফয়যুল্লাহ রহ. এর দু'আ পেয়েছেন বহুবার। আর পরিণত বয়সে করাচিতে পেয়েছেন যামানার এক মহামনীষী হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ. এর মহান সান্নিধ্য। তাছাড়া তিনি হাতিয়ার হযরত মুফতী সাইফুল ইসলাম রহ. এর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছেন। নাহ্‌ব, সরফ, ফারসী, উর্দূ অনেক কিতাব তিনি হযরতের কাছে পড়েছেন।

হাটহাজারী মাদরাসার আসাতিযায়ে কেরাম অনেকেই হযরতের উস্তাদ। তাদের বিশেষ কয়েকজন হলেন–

(ক) শাহ আব্দুল আজিজ রহ.; শাইখুল হাদীস, হাটহাজারী মাদরাসা,

(খ) শাহ আহমাদুল হক রহ.; মুফতিয়ে আযম, হাটহাজারী মাদরাসা,

(গ) আল্লামা শাহ আহমাদ শফী দা.বা.; বর্তমান শাইখুল হাদীস ও মুহতামিম, হাটহাজারী মাদরাসা।

পাকিস্তানের বর্তমান জামিয়াতুর রশীদের পৃষ্ঠপোষক হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুর রহিম (বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহ্)-সম্পর্কে হযরত প্রায়ই বলেন, আমি পাকিস্তানের হযরতের পর সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি আমার উস্তাদে মুহতারাম ও বর্তমান শাইখ মুফতী আব্দুর রহীম সাহেব দা.বা. থেকে। দরসে নেযামীর বেশিরভাগ জটিল কিতাবগুলো আমি হযরতের নিকট দ্বিতীয়বার পড়েছি। এতে আমার অনেক ফায়দা হয়েছে। বিশেষ করে নাহ্‌ব-সরফের কিতাবসমূহে ও ফিকহী বিভিন্ন তাহকীকাতে আল্লাহ হযরতকে এমন মেধা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছেন যার নজির মেলা ভার।

কর্মজীবন ও অধ্যাপনা

হযরতর কর্মজীবনের সূচনাও হয়েছে বড় বিস্ময়করভাবে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের কোন একসময়। সবেমাত্র পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরেছেন। প্রথমে নিজ বাড়ির দরজায় ছোট্ট একটি মসজিদে কিছুদিন অবস্থান করেন। তখন উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসাসহ দেশের অনেক বড় বড় মাদরাসা থেকে খিদমতের প্রস্তাব আসতে থাকে। হযরত নিজে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে নিজ শাইখের নিকট চিঠি লেখেন। এদিকে বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু তালিবে ইলম এসে ঐ মসজিদে হযরতের নিকট পড়া-লেখার জন্য জড়ো হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। তবে হযরত স্থায়ীভাবে তাদেরকে থাকার সিদ্ধান্ত না দিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে প্রেরিত চিঠির

উত্তর এসে পৌঁছল– যাতে উল্লেখ রয়েছে– যেভাবে আছো সেভাবেই থাকো। অর্থ্যাৎ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যে মসজিদে আছো সেখানেই খিদমত শুরু করে দাও। এজন্যই বলা হয়,
‘কলন্দর হর-চে গো-য়্যাদ, দীদাঃ গো-য়্যাদ।’ অর্থাৎ আল্লাহওয়ালারা যা বলেন দেখে-শোনেই বলেন। তো হযরত শাইখের নির্দেশ পেয়ে ছাত্রদের স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি দিয়ে দেন। আলহামদুলিল্লাহ, অল্প সময়ের মধ্যে হযরতের তা'লীম, তরবিয়ত ও যোগ্যতার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে ছাত্রসংখ্যাও দিনদিন বাড়তে থাকে। একসময় মসজিদও ধারণক্ষমতার বাইরে চলে যায়।
বাড়ির পাশের এক মুখলিস হাজী সাহেব। মক্কাপ্রবাসী। আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আলী সাহেব। অত্যন্ত দীনদার ও হৃদয়বান। পূর্ব থেকেই ছাত্রদের মসজিদে থাকার কথা শুনে দেশে এসে স্বচক্ষে দেখেন এবং নিজ উদ্যোগে একটি জায়গা খরিদ করে নিজ তহবিল থেকে একটি ঘর নির্মাণের প্রস্তাব দেন। তারপর পাকিস্তানের হযরতের অনুমতি পেয়ে ভিত গড়ে তোলেন দেশনন্দিত বিদ্যাপীঠ জামি'আ রশীদিয়ার। আজ রশীদিয়া একটি প্রেরণা, একটি ইতিহাস।
বর্তমানে রশীদিয়া ছাড়াও দেশের বহু প্রতিষ্ঠান হযরতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। বহু প্রতিষ্ঠান থেকে হযরতকে দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন করা হয়; কিন্তু তিনি হক আদায় না হওয়ার অজুহাতে এড়িয়ে যান।
তা'লীম-তরবিয়াতের ক্ষেত্রে হযরতের দৃষ্টিভঙ্গি বড় চমৎকার। তিনি মনে করেন, সাধারণত মাদরাসাগুলোতে তা'লীম, তরবিয়াত উভয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ মাদরাসা হচ্ছে তা'লীম, তরবিয়ত উভয়টিরই কেন্দ্র। কোন কোন মাদরাসায় তো তা'লীমের মানও তেমন নেই। আর কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে তা'লীমের গুরুত্ব যদিও কিছুটা রয়েছে, কিন্তু তরবিয়তের বিষয়টি একেবারেই গুরুত্বহীন। অথচ ছাত্রদের তরবিয়তের বিষয়গুলো অর্থাৎ আমলী বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া দরকার। না হয় এই ইলম আসহাবে সুফফার মীরাস হবে না। বর্তমানে শিক্ষার প্রতি যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে যদি তরবিয়ত বা দীক্ষার প্রতিও সমান গুরুত্ব দেয়া হতো তাহলে মাদরাসাগুলোর অবস্থা আরো উন্নত হতো।
জামি'আর আসাতিযায়ে কেরামকে হযরত প্রায়ই বলেন, ছাত্রদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথেই সকলের ইসলাহের উদ্দেশ্যে কিছু কথা যেন অবশ্যই বলা হয়। প্রয়োজনে সবকের মাঝেও ইসলাহী এবং তরবিয়তী কথা-বার্তা বলতে থাকা।
ছাত্রদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন বাদ আসর মাসজিদে রশীদে সকল ছাত্রের উদ্দেশ্যে হযরত সংক্ষিপ্ত নসীহত করেন। এতে ছাত্রদের যারপরনাই উপকার হয়। অনেকের জীবনের মোড়ও পরিবর্তন হয়ে যায়।

উলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের মাঝে দীনী খিদমত

প্রতি রবিবার বাদ মাগরিব হযরত জামি'আর দারুল ইরশাদে (খানকাতে) উলামা ও আসাতিযায়ে কেরামের উদ্দেশে বিশেষ নসীহত করেন। এ সময় উস্তাদদের ত্রুটিগুলো মহব্বতের সাথে পর্যালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মাদরাসা তো আসলে উস্তাদদেরই নাম। যে মাদরাসার উস্তাদগণ তরবিয়তওয়ালা হবেন সে মাদরাসার ছাত্রদের হালতও ভিন্ন রকম হবে। কারণ উস্তাদের গুণাবলী সহজাতভাবেই তার ছাত্রদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে।
কিছুদিন থেকে জামি'আর উস্তাদদের জন্য প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব হযরত গুরুত্বপূর্ণ একটি মজলিস শুরু করেছেন। এতে উস্তাদদের মা'মূলাতের খোঁজ-খবর নেয়াসহ বিভিন্ন জরুরী ইলমী তাহকীকাত করানো হয়। এছাড়াও তিনি দেশের বহু উলামায়ে কেরামকে বিভিন্নভাবে ইলমী রাহনুমায়ী করে থকেন। উল্লেখ্য, জামি'আর সকল আসাতিযা হযরতের সঙ্গে ইসলাহী তা'আল্লুক রাখেন।
জনসাধারণের মাঝেও দীনী কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়ার প্রতি তিনি ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। জামি'আর চারপাশে ৪/৫ কি.মি. পর্যন্ত প্রায় সকল মসজিদ জামি'আর বিশেষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বর্তমানে পরিচালিত মসজিদ ৪৬টি ও মকতব ৪৩টি– যার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ১,৩১৮ জন। জামি'আর ৩১ জন উস্তাদকে জুমুআর নামায পড়ানোর যিম্মাদারী দিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে জনগণ তাদের মাধ্যমে সহীহ দীন পেয়ে যায়। এছাড়া এলাকায় প্রায় ১৫০টিরও বেশি জায়গির রয়েছে। জায়গির, মকতব ও মসজিদ মিলে সর্বমোট ৫৮টি পয়েন্টে ২২৭জন ছাত্র মাদরাসা এলাকাতে অবস্থান করছে। ছাত্রদের নিয়মিত আসা-যাওয়া ও অবস্থানের ফলে সমাজ ও জনসাধারণের দীনী অনেক উপকার হচ্ছে। প্রতি বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টার ৫/৭টি জামাআত এলাকার মসজিদগুলোতে দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে পাঠানো হয় এবং এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য জামি'আর সাল-ওয়ালা কয়েকজন আসাতিযায়ে কেরামও বিশেষ দায়িত্বে রয়েছেন।
প্রতি শুক্রবার বাদ মাগরিব মসজিদে রশীদে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকজন হযরতের ইসলাহী বয়ানে শরীক হন। এতে শ্রোতাদের মধ্যে আকীদার শুদ্ধি ও আমলের জযবা পয়দা হয়।

রশীদিয়ার তারাক্কী ও হযরতের তাকওয়া

জামি'আ রশীদিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে। দুই যুগ পার হয়নি। অথচ আজ রশীদিয়া পরিণত হয়েছে এক বিশাল মহীরূহে। দশ একর জমিতে ১১০ জন উস্তাদ নিয়ে চার সহস্রাধিক তালিবে ইলম। তা'লীম-তরবিয়াত, আমল-আখলাক আর শিষ্টাচারের পূর্ণাঙ্গতা যে কেউ দেখামাত্র উপলব্ধি করতে পারবে।
উস্তাদগণের বিনয়-নম্রতা, মেহনত-মুজাহাদার বর্ণনাও শেষ করা যাবে না। জিজ্ঞেস করেছিলাম নায়িবে মুহতামিম মুফতী ফয়যুল্লাহ সাহেবকে রশীদিয়ার তা'লীমী নেযাম সম্পর্কে। তিনি হযরতের তা'লীমী নেযামের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা সবিশেষ তুলে ধরে বলেন, হযরত তামরীন অর্থাৎ অনুশীলনের মাধ্যমে পড়ানোর জন্য আসাতিযায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং ছাত্রদের থেকে সবক আদায় করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকেন। এ ব্যাপারে হযরত বলে থাকেন, মেধাবী ছাত্র তো উস্তাদের বিশেষ মেহনত ছাড়াও নিজ প্রচেষ্টায় সফলকাম হতে পারে। উস্তাদের বাহাদুরী হচ্ছে দুর্বল ছাত্রদেরকে ওঠানো। যোগ্য উস্তাদ তো সেই, যে দুর্বল ছাত্রদের ওপর মেহনত করে তাদেরকে উঠিয়ে নিতে পারে।
যে জামাআতগুলোতে ছাত্র সংখ্যা বেশি, সবক আদায় ও তামরীনের মাধ্যমে পড়ানোর সুবিধার্থে সেগুলোকে একাধিক গ্রুপে ভাগ করে পড়ানো হয়। যেমন, বর্তমানে কাফিয়া জামাআত তিন গ্রুপে, হিদায়াতুন্নাহু জামাআত আট গ্রুপে, নাহবেমীর জামাআত দশ গ্রুপে, সরফ

জামাআত দশ গ্রুপে, ফার্সী জামাআত ছয় গ্রুপে, উর্দূ জামাআত চৌদ্দ গ্রুপে পড়ানো হচ্ছে। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যিম্মাদার উস্তাদ রয়েছেন। যাতে ২৪ ঘণ্টা ছাত্রদের সার্বিক চিত্র উস্তাদদের সামনে থাকে। কেননা ইলমী যোগ্যতায় পূর্ণতার লক্ষ্যে প্রাথমিক জামাআতগুলোর পড়ালেখার তদারকিতে সবিশেষ গুরুত্ব রাখে।

জামি'আর সিনিয়র উস্তাদ মাওলানা মামুন সাহেব। একজন আদর্শ উস্তাদ। হযরতের ছাত্র থেকে এখন জামি'আর আত্মত্যাগী উস্তাদ। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার দৃষ্টিতে রশীদিয়ার এতোটা তারাক্কির বাহ্যিক কারণ কী? তিনি বললেন, মুহতামিম সাহেবের আকাবির-আসলাফের যথার্থ অনুকরণ, বিনয়, নম্রতা আর স্বচ্ছ মু'আমালাত-মু'আশারাত।

অবশ্য দেশের এতো বড় একজন প্রাজ্ঞ আলেমে দীন, বহু প্রতিষ্ঠানের প্রভাবশালী কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও তিনি কতোটা স্বভাবজাত বিনয় ও উন্নত চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী তা সামান্য সময়ের সাক্ষাত লাভেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমি আপ্লুত হয়েছি যখন তিনি নিজে দস্তরখানে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। স্বহস্তে মেহমানদের আপ্যায়ন করেছিলেন। মুগ্ধ হয়েছি হযরতের নির্মোহ রূপ আর চলন-বলনের স্বাভাবিকতা দেখে।

মামুন সাহেব বলছিলেন, আমরা দেখেছি হযরতের তাকওয়া, খোদাভীতি ও লেনদেনের স্বচ্ছতার চিত্র। কোন কারণে বাসার মোবাইলটি মাদরাসায় চার্জ দেয়া হলে এর ব্যয় পরিশোধ করা যিনি নিজের জন্য ফরয মনে করেন, সেখানে অন্যান্য লেনদেনে কতোটা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হবেন তা সহজেই অনুমেয়। আমরা হযরতের সার্বিক বিষয়ে গর্ব করে বলতে পারি, জনসাধারণ, উলামায়ে কেরাম ও তলাবায়ে ইযামের মাঝে দীনী আমানত পৌঁছে দেয়ার হযরত যে ফিকির করেন তা ইতিহাস হওয়ার মতো। আমরা ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনে তার যে উন্নত চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি তা সত্যিই অনুসরণীয়।

আমরা মনে করি, হযরত জাতির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। তলাবা-উলামা সকলের জন্য তিনি এক স্বপ্নপুরুষ। রাব্বে পাক হযরতের নেক হায়াতকে আমাদের সকলের উপরে দীর্ঘায়িত করুন। আমীন।

লেখক : মুদাররিস, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

(৩২ পৃষ্ঠার পর; গ্রন্থ পরিচিতি)

তবে আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ. কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত সংকলনটি অধিক উপকারী।

ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, পাশ্চাত্যের ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুলেখক মুহতারাম খালেদ বেগ। নাম দিয়েছেন The Accepted Whispers। মুহতারাম খালেদ বেগ পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। আল-বালাগ ই-জার্নালের সম্পাদক। ইসলাম এবং সমসাময়িক বিষয়ের উপর ১৯৮৬ সাল থেকে লিখছেন। তার লেখার ধরন, ভাষাশৈলী ও গতিময়তা যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি তার অন্তর্নিহিত ইসলামী বোধ ও প্রকাশ এদেশের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতেও প্রশংসনীয়। এ কিতাবটিও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং The Accepted Whispers কিতাবটি তার অনন্য কীর্তি। মুনাজাতে মাকবূল নিয়ে এত তথ্যনির্ভর ও বিশ্লেষণধর্মী প্রকাশনা সম্ভবত আর কোন ভাষায় হয়নি। মুহতারাম অনুবাদক মুনাজাতে মাকবুলের দু'আগুলোর অর্থ কেবল ইংরেজিতে অনুবাদই করেননি; প্রতিটি দু'আর মূল উৎস উল্লেখপূর্বক মূল্যবান টীকাও সংযোজন করেছেন। এসব টীকায় দু'আর সারমর্ম, প্রেক্ষিত ও ফাযাইল বর্ণিত হয়েছে, যা এককথায় অসাধারণ।

বাংলা ভাষায়ও এটি অনেকেই অনুবাদ করেছেন। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি এই–

১. মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. ও শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. এর যৌথ অনুবাদ, যা হামিদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২. শাইখুল হাদীস হাবীবুর রহমান সাহেব দা.বা.-এর অনুবাদ, যা আলকাউসার প্রকাশনী প্রকাশ করেছে।

৩. মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ দা.বা. (সহসম্পাদক, মাসিক আলকাউসার), যা মাকতাবতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ. কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত নুসখাটি অনুবাদ করেছেন এবং আরো কিছু জরুরী টীকা সংযুক্ত করেছেন। ফলে এর উপকারিতা আরো বহুগুণে বেড়ে গেছে।

৪. মুহতারাম আদম আলী সাহেব, (হাফেজ্জী হুজুর রহ. ও হারদুঈ হযরত রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব দা.বা.-এর একান্ত আস্থাভাজন ও প্রিয় মানুষ। ইতোমধ্যে প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন করে এবং হযরতের আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড-সহ বহু দেশের সফরনামা লিখে সমাদৃত হয়েছেন।) তিনি মূলত মুহতারাম খালেদ বেগ কর্তৃক অনূদিত কিতাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন, যেটির টীকায় অত্যন্ত সহজ-সাবলীলভাবে দু'আর সারমর্ম, প্রেক্ষিত ও ফাযাইল বর্ণিত হয়েছে। আমাদের জানা মতে, বাংলায় অনূদিত মুনাজাতে মাকবুলের এটিই সবচেয়ে তথ্যনির্ভর ও সমৃদ্ধ অনুবাদ। এটির পৃষ্ঠা-প্রচ্ছদও বেশ নজরকাড়া। এটি মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

হে আল্লাহ! কুরআন-হাদীসের এ মাকবূল দু'আর ভাণ্ডার 'মুনাজাতে মাকবূল' নিয়মিত পড়ার পাশাপাশি এর মর্মস্পর্শী আবেদন-নিবেদনগুলো উপলব্ধি করে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনসহ পরবর্তী সকল আল্লাহওয়ালাদের অনুসরণে দিল দিয়ে আপনার দরবারে বেশী বেশী দু'আ ও মুনাজাতের তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া আরহামার রাহিমীন!!

লেখক : শাইখুল হাদীস, আশরাফুল মাদারিস, সতীঘাটা, পান্তাপাড়া, সদর যশোর

(৪৬ পৃষ্ঠার পর; তালিবুল ইলম!...)

তুমি যদি সবগুলো কিতাবের বিনিময়ে আমার কাছে এক আটি সবজিও চাও, আমি তাও দেব না তোমাকে।' তিনি বললেন, আমি তোমার উপদেশ মেনেছিলাম এবং আমার সকল কিতাবগুলো মদের মটকায় ভরেছিলাম। ফলে তুমি আজ দেখতে পাচ্ছো যে, তা আমায় কি ফলাফল দিয়েছে। প্রিয় তালিবুল ইলম! এসো আমরাও ইলম অর্জনের জন্য নিজকে উজাড় করে দেই। গভীরতা ও দক্ষতা অর্জন করি। ইখলাস, তাক্বওয়া ও একাগ্রচিত্তে ইলম সাধনার মাধ্যমে রুসূখ ফিদ্দীন অর্জন করি। খোদার কসম, আল্লাহ তা'আলা শান্তি, তৃপ্তি ও ইজ্জতের যিন্দেগী দান করবেন। কেননা প্রবাদ আছে, إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيّعه سقط 'ইলম হল দীন, যে তাকে সংরক্ষণ করে সে বড় হয়, নেতা হয়। আর যে তাকে খুইয়ে বসে সে ব্যর্থ হয়।'

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইলমের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝে তার মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া; খতীব, বাইতুল আমান জামে মসজিদ, উত্তরা

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মুহাম্মাদ মনসূর আলী
ঝাউচর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

২৫৬ প্রশ্ন : (ক) আমার পৈত্রিক সম্পত্তিতে আমি বাড়ি করে বসবাস করছি। এর পাশে আমার আরো কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি রয়েছে। আমি আমার ভাইদের কাছ থেকে আরো কিছু সম্পত্তি খরিদ করেছি ভবিষ্যতে সন্তানদের বসবাসের জন্য। উক্ত সম্পত্তির ও বসবাসকৃত সম্পত্তির যাকাত দিতে হবে কি না?

(খ) আমার স্ত্রীর ৫ ভরি স্বর্ণ আছে; এর হকদার শুধুই তিনি। এছাড়া তার আর কোন সম্পত্তি নেই। উক্ত স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কি না?

(গ) আমার ভাই-বোন খুবই গরীব। তাদের যাকাত দেয়ার মতো অর্থ-সম্পদ নেই। আমার যাকাতের টাকা তাদেরকে দিতে পারব কি না?

উত্তর : (ক) প্রশ্নোল্লিখিত সুরতে আপনার বসবাসে ব্যবহৃত ও ভবিষ্যতে সন্তানদের বসবাসের জন্য ক্রয়কৃত সম্পত্তির যাকাত দিতে হবে না। কেননা সম্পত্তির যাকাত ঐ সময় দিতে হয় যখন তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ১০৪৫৯, ১০৪৬১, ফাতাওয়া শামী ২/২৬২, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪৯৫, ৫০৮)

(খ) বর্ণনা অনুযায়ী আপনার স্ত্রীর ৫ ভরি স্বর্ণের উপর যাকাত দিতে হবে না। যেহেতু এছাড়া তার আর কোন সম্পত্তি নেই।

উল্লেখ্য, সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের উপর যাকাত দিতে হয়। আর যদি সাড়ে সাত তোলা থেকে কম থাকে আর তার কাছে নগদ কিছু টাকা থাকে কিংবা রৌপ্যের অলঙ্কার থাকে এবং সব মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্য সমপরিমাণ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার উপর যাকাত ফরয হবে। সুতরাং আপনার স্ত্রীর নিকট যদি নগদ কিছু টাকা থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় নয়। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৫৭৩, ফাতাওয়া শামী ২/২৯৫, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪৩৪)

(গ) আপনার ভাই-বোন যদি যাকাত গ্রহণ করার মতো গরীব হন তাহলে তাদেরকে আপনার যাকাতের টাকা দিতে পারবেন। এতে কোন সমস্যা নেই। তবে দেয়ার সময় হাদিয়া বলে দেয়া ভালো; যাতে মনোকষ্ট না হয়। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯০, ফাতাওয়া শামী ২/৩৫৪, কিতাবুন নাওয়াযিল ৭/১০৪)

আব্দুল আলীম
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

২৫৭ প্রশ্ন : সরকারি তিতুমীর কলেজে একটি পুরাতন মসজিদ রয়েছে, যা সরকারি জায়গায় অবস্থিত। পূর্বের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পরামর্শক্রমে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদে জুমু'আর নামায, ঈদের নামাযসহ ওয়াক্তিয়া নামায পড়ানো হয়। তবে মসজিদটিতে জায়গা সংকুলান হয় না। তাছাড়া কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষার দিনে মুসল্লীদের মসজিদে প্রবেশ করতে অসুবিধা হয়। বিধায় মসজিদটি স্থানান্তর করা হবে। রাস্তা এবং গেইটের পাশে মসজিদটি স্থানান্তর করা হলে মহল্লা এবং সাধারণ মুসল্লীদের নামায পড়তে সুবিধা হবে। এজন্য শিক্ষাভবনের অনুমতিক্রমে পাঁচ তলা বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

আমাদের জানার বিষয় হলো, পুরাতন মসজিদের জায়গা এবং ঘরসহ অন্যান্য মালামাল কলেজের কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না? যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে কলেজের কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর : উপযুক্ত স্থানে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী ও দায়িত্বশীলদের সর্বসম্মত উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণ করে নিয়মিত নামায আদায় করে থাকলে সে স্থান ও ঘরটি শরঈ মসজিদে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে পুরাতন মসজিদটি শরঈ মসজিদ হিসেবে পরিগণিত। আর কোন স্থান একবার শরঈ মসজিদ হয়ে গেলে কিয়ামত পর্যন্ত তা মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে। তা কখনো স্থানান্তর করা যায় না। প্রয়োজনে অন্যত্র নতুন মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। কিন্তু পুরাতন মসজিদও আবাদ রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

কাজেই তিতুমীর কলেজের পুরাতন মসজিদটি পূর্বের জায়গায় বহাল রেখে অন্তত ওয়াক্তিয়া নামাযের মাধ্যমে সেটাকে চালু রাখতে হবে। তা ধ্বংস করা যাবে না বা অনাবাদ হতে দেয়া যাবে না এবং মসজিদের জায়গা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

অবশ্য বর্ণিত সমস্যাবলীর আলোকে গেইটের পার্শ্বে বড় আকারে নতুন মসজিদ করার অবকাশ আছে। জুমু'আ ও ঈদের সুবিধার্থে বড়টিকে নির্ধরণ করার সুযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, কোন মসজিদ পুনঃনির্মাণের সময় পুরাতন মসজিদের ঘরসহ অন্যান্য মালামাল অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতে হলে তা উপযুক্ত দরে বিক্রয়ের মাধ্যমে করতে হবে এবং ক্রেতার দায়িত্ব হলো, সেগুলো সম্মানজনক স্থানে বা কাজে ব্যবহার করা। বিনামূল্যে দেয়া যেমন জায়েয নেই, তেমনিভাবে অসম্মানজনক স্থানে বা কাজে (টয়লেট বা সুয়ারেজ লাইন ইত্যাদির নির্মাণ) ব্যবহার করাও জায়েয নেই। (সূরা জিন-১৮, আল-বাহরুর রায়িক ৫/২৭১-২৭২, ফাতাওয়া শামী ৪/৩৫৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৩/২৯৪, ৩১৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২১/২৭৪, ২৮৪)

মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম
সাভার বাজার রোড, সাভার, ঢাকা

২৫৮ প্রশ্ন : (ক) উযূর শুরুর এ بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام الاسلام حق والكفر باطل الاسلام نور والكفر ظلمات দু'আটি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূর শুরুতে কী দু'আ পড়তেন?

(খ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আরবী নিয়ত কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের নিয়ত কিভাবে করতেন? আরবীতে নিয়ত করা জরুরী কি না?

(গ) ৯ই যিলহজ্জ আরাফার দিন। ঐ দিন রোযা রাখলে আগে ও পরের দুই বছরের গুনাহ মাফ হয়। জানার বিষয় হলো, আমরা আমাদের দেশের তারিখ অনুযায়ী ৯ তারিখে রোযা রাখব, নাকি হাজী সাহেবদের আরাফার দিন রোযা রাখব?

উত্তর : (ক) হাদীসে নববীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি উযূর শুরুতে তাসমিয়া বা

বিসমিল্লাহ পড়বে না, তার উযূ পরিপূর্ণ হবে না। অর্থাৎ সে উযূর সওয়াব পাবে না।

উল্লিখিত পুরো দু'আটি সরাসরি হাদীসে পাওয়া যায় না। 'মু'জামুত তাবারানী'র এক হাদীসে এতটুকু পাওয়া যায় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ হুরাইরা রাযি. কে উযূর সময় بسم الله العظيم والحمد لله পড়তে নির্দেশ করেছেন। বাকি দু'আটি بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام পর্যন্ত সালাফে সালিহীনের কারো থেকে বর্ণিত। সুতরাং তা সুন্নাত নয়; বরং বৈধ মনে করে পড়তে পারে। (সুনানে আবূ দাউদ ১/২৫, মু'জামুস সগীর লিত-তাবারানী; হা.নং ১৮৭, ফাতাওয়া শামী ১/১০৯, আল-বিনায়াহ শরহুল হিদায়া ১/১৯৪, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৯)

(খ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শুরুতে নিয়ত করা শর্ত। মুখে নিয়ত করা বা আরবীতে নিয়ত করা জরুরী নয় এবং কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিতও নয়। কেননা নিয়ত হলো অন্তরের ইচ্ছার নাম। কাজেই মুখে নিয়ত করা জরুরী নয়। অন্তরের নিয়তের সাথে মৌখিক নিয়ত করলে কোন সমস্যা নেই। বরং অন্তরে খেয়াল স্থির করতে অক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য মুখে উচ্চারণ করা উচিত।

আর অনারবদের জন্য আরবীতে নিয়ত করা মোটেও জরুরী নয়। যে কোন ভাষায় নিয়ত করার অবকাশ রয়েছে। যারা অর্থ বোঝে না তারা আরবীতে নিয়ত করার সময় অনেকের মূল ওয়াক্তের কথা স্মরণ হয় না, তাদের নিয়ত সহীহ না হওয়ায় নামায সহীহ হবে না। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৩৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৬৫, আল-বাহরুর রায়িক ১/২৯২, ২৯৩, কিতাবুন নাওয়াযিল ৩/৪৫০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ২/১৪৯)

(গ) ৯ই যিলহজ্জ আরাফার দিন রোযা রাখার যে ফযীলতের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা রোযাদার ব্যক্তির অবস্থানস্থলের ৯ই যিলহজ্জ ধর্তব্য হবে। দূরবর্তী এলাকাসমূহে আরাফার ময়দানে হাজী সাহেবদের উকূফের দিনের হিসেব গণ্য হবে না। (সহীহ মুসলিম ২/৮১৮, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৫৫০, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৩২৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৩৪৬)

মিনহাজুল আরেফীন
শান্তিনগর, ঢাকা

২৫৯ প্রশ্ন : (ক) নামাযে উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল কিংবা এক বিঘত পরিমাণ ফাঁকা রেখে দাঁড়ানোর দলীল প্রয়োজন। অন্যত্র আছে, পা দু'টিকে আরামদায়ক দূরত্বে ফাঁকা রেখে দাঁড়ানো, এক্ষেত্রে ফাঁকা রাখার সীমা কতটুকু?

(খ) উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও গোড়ালিদ্বয়ের মাঝে সমান দূরত্ব রাখার বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই।

(গ) দাঁড়ানো অবস্থায় ঘাড় সোজা ও চেহারা কা'বামুখী রাখা। অন্যত্র 'সুনানে বাইহাকী'তে আছে, নবীজী মাথা নিচু করে যমীনের দিকে দৃষ্টি রাখতেন, যাতে বিনয় প্রকাশ হয়। দুই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে সম্ভব?

উত্তর : (ক) পুরুষের শারীরিক গঠনের উপর নির্ভর করে যেভাবে আরাম হয় উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল থেকে এক বিঘত পরিমাণ ফাঁকা রেখে দাঁড়ানো সুন্নাত। অন্যত্র যেখানে পা দু'টিকে আরামদায়ক দূরত্বে ফাঁকা রেখে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা উল্লিখিত পরিমাণই উদ্দেশ্য। কেননা উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল থেকে এক বিঘত পরিমাণ ফাঁকা রেখে দাঁড়ালে আরামদায়ক হয়। অবশ্য অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবান বা একশিরায় আক্রান্ত বা এ ধরনের ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির কথা ভিন্ন; তারা নিজেদের সুবিধা মত দাঁড়াবে।

ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আতা রাযি.-কে পুরুষ লোকের জন্য নামাযের মধ্যে উভয় পা মিলিয়ে রাখার মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, উভয় পা একেবারে মিলানো যাবে না (আবার উভয় পায়ের মাঝে অতিরিক্ত ফাঁকাও রাখা যাবে না); বরং মাঝামাঝি রাখতে হবে। ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, হযরত নাফে' আমাকে বলেছেন, হযরত ইবনে উমর রাযি. উভয় পায়ের মাঝে অতিরিক্ত ফাঁকা রাখতেন না, আবার এক পা অপর পায়ের সঙ্গে একেবারে মিলিয়েও রাখতেন না; বরং মাঝামাঝি রাখতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ৩৩০০)

হযরত আবূ উবাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. একব্যক্তিকে দুই পা মিলিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখে বললেন, সে তো সুন্নাতের খেলাফ নামায পড়ছে। যদি সে দুই পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখতো, তাহলে বেশি ভালো ছিল। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৮৯২)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. বলেন, مراوحة দ্বারা উদ্দেশ্যে দুই পায়ের মাঝে মুস্তাহাব পরিমাণ ফাঁকা রাখা। তখন হাদীসটি নফল নামাযের সাথে খাস হওয়ার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

নামাযে দুই পায়ের মাঝে হাতের চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রেখে দাঁড়ানো সুন্নাত। কেননা এভাবে দাঁড়ানো খুশুখুযুর জন্য বেশি সহায়ক। অবশ্য অতিরিক্ত মোটা বা একশিরায় আক্রান্ত এ ধরনের ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের সুবিধা মত দাঁড়াবে। (হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৬২)

(খ) উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও গোড়ালিদ্বয়ের মাঝে সমান দূরত্ব রাখা সুন্নাত।

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, একব্যক্তি এমতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করল যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। তারপর লোকটি নামায আদায় করল। (দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশে) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি যখন নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন উত্তমরূপে উযূ করবে। তারপর কিবলামুখী হবে। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬২৫১)

উল্লেখ্য, এ হাদীসে নামাযের পূর্বে কিবলামুখী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশের ব্যাপকতার মধ্যে পায়ের আঙ্গুলসমূহও কিবলামুখী করে রাখা অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ নির্দেশকে পরিপূর্ণভাবে তখনই পালন করা হবে যখন প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ মুসল্লী কিবলামুখী হবে। তাছাড়া ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায় এনেছেন باب يستقبل باطراف رجليه القبلة (পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী রাখার অনুচ্ছেদ) (১/১৬২)। এ বিষয়টি হযরত আবূ হুমাইদ রাযি. প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ হুমাইদ রাযি. উপস্থিত সঙ্গীদের সামনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে বলেন,

واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় পায়ের আঙ্গুল সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮২৮)

(গ) দাঁড়ানো অবস্থায় ঘাড় স্বাভাবিকভাবে সোজা রাখা ও চেহারা কিবলামুখী রাখা সুন্নাত। সুনানে

বাইহাকীর হাদীসের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। কেননা সুনানে বাইহাকীতে (হাদীস নং ৩৫৪২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রথম ওহী অবতরণের অপেক্ষায় নামাযের মধ্যেও আসমানের দিকে তাকাতেন। পরবর্তীতে الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে নামাযে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বের ন্যায় আসমানের দিকে তাকাতেন না; বরং فطأطأ رأسه অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে ঘাড় সোজা রাখতেন এবং চেহারা কিবলামুখী রাখতেন। অতএব সুনানে বাইহাকীর হাদীসটি দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে উল্লিখিত সুন্নাত তরীকার পরিপন্থী নয়।

হযরত আবূ হুমাইদ আস-সাঈদী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩০৪)

হযরত তাউস রহ. বলেন, আমি নামাযে হযরত ইবনে উমর রাযি. এর মত চেহারা, দু'হাত এবং দু'পা অধিক কিবলামুখী করে রাখতে কাউকে দেখিনি। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ২৯৩৬)

বি.দ্র. দুই পা সোজাভাবে কাতারের উপর কিবলামুখী করে রাখলে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও গোড়ালির মাঝে সমান দূরত্ব থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রথম ওহী অবতরণের অপেক্ষায় নামাযের মধ্যেও আসমানের দিকে তাকাতেন। পরবর্তীতে الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে নামাযে নবীজী পূর্বের ন্যায় আসমানের দিকে তাকাতেন না। মাথা উপরের দিক থেকে নামিয়ে নিচের দিকে নযর রাখতেন। (সুনানে বাইহাকী ২/২৮৩)

হযরত আবূ হুমাইদ আস-সাঈদী রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, এরপর তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। ততক্ষণে শরীরের প্রত্যেকটি হাড় নিজ স্থানে স্বাভাবিকভাবে স্থির হয়ে যেতো। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৭৩০)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, হাদিসটি সহীহ, মুতালাক্কা বিল-কুবুল, এতে কোন ইল্লত নেই। (তাহযীবে সুনানে আবূ দাউদ ১/২৬০)

হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) আকাশের দিকে চোখ উঠাতেন। অতঃপর তাঁকে 'খুশু'র নির্দেশ দেয়া হলো। তখন তিনি সিজদার স্থানে চোখ রাখলেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ৩২৬১) হাদীসটির সনদ সহীহ; তবে এটি মুরসাল। এটিকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে হাকেম রহ. মুসতাদরাকে (হাদীস নং ৩৪৮৩) বর্ণনা করেছেন। আল্লামা মারদীনী রহ. অবিচ্ছিন্ন সূত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাছাড়া ইবনে সীরীন রহ. এর মুরসাল রেওয়ায়াত মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছেন। (আত-তামহীদ ১/৩৯)

তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা ঝুকানো ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো। এটা এমন একটি আমল যার দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই; সর্বযুগে সকলের কাছে স্বীকৃত আমল। (মিন্নাতুল ফাত্তাহ ২/১২৯)

এম. এ. হালিম গজনবী
ধানমন্ডি, ঢাকা

২৬০ প্রশ্ন : জামে মসজিদে আযানের পর পরই মুসল্লীগণ উপস্থিত হতে থাকেন এবং অধিকাংশই স্ব-স্ব ইবাদতে (নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-ফিকির, তাসবীহ-তাহলীল, মুনাজাত ইত্যাদি) একাগ্রচিত্তে মশগুল হয়ে যান। এমতাবস্থায় কিছু কিছু মুসল্লী সরবে কথা বলতে বলতে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেউ কেউ কথা চালুও রাখেন। আবার কাউকে মোবাইলে নিম্নস্বরে বা উচ্চস্বরে কথা বলতেও দেখা যায়। তাছাড়া মসজিদে অবস্থানরত স্বল্পসংখ্যক মুসল্লী পরস্পর সরবে অল্প সময় বা দীর্ঘ সময় কথা বলতে থাকেন এবং এ অবস্থাটা ফরয নামায শুরু হওয়া পর্যন্ত বিরাজ করে।

ফরয নামায শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই যাদের সুন্নাত নামায তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কথাবার্তা শুরু করেন এবং কেউ কেউ পরস্পর সরবে কথা বলতে বলতে মসজিদ ত্যাগ করেন। ফলে ফরয নামাযের পূর্বাপর সময়ে নামাযরত মুসল্লীগণের ইবাদত বিঘ্নিত হয়।

উপরোল্লিখিত অবস্থায় যারা সরবে কথাবার্তা বলে বা মোবাইল ব্যবহার করে ইবাদতরত ব্যক্তিগণের ইবাদত বিঘ্নিত করেন তাদের এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ধর্মীয় বিধান প্রদানের জন্য আপনাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ করছি।

উত্তর : মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর এবং দুনিয়ার সবচে' উত্তম স্থান। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত তথা নামায, যিকর, তিলাওয়াতের জন্যই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুতরাং মসজিদে ইবাদতকারীগণই অগ্রাধিকার পাবেন। সেক্ষেত্রে ফরয বা সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযের সময় সম্মিলিত বা একাকী কোন দীনী বা দুনিয়াবী প্রোগ্রাম বা কাজ করা যাবে না, যাতে মুসল্লীগণের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তবে নফল ইবাদতের সময় যদি কোন সম্মিলিত দীনী প্রোগ্রাম হয় যাতে কারো ইবাদত বিঘ্নিত হতে পারে, তাহলে ইবাদতকারীগণ তা থেকে একটু দূরে অবস্থান করে ইবাদত করবেন। আর নফলের সময় যদি মসজিদে একাকী কোন কথা বলতেই হয়, তাহলে মৃদুস্বরে এবং মুসল্লীগণ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বলতে হবে যাতে কারো কোন ক্ষতি না হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন মসজিদের গুরুত্ব ও সম্মান বজায় রেখে অল্প ও সংক্ষেপে কথা বলা হয়। মসজিদে কোন অনর্থক গল্প-গুজব বা অহেতুক দুনিয়াবী কথা বলা জায়েয নেই। নিম্নে মসজিদের আযমত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মসজিদে ছিলাম, যখন একজন গ্রাম্য লোক মসজিদে এসে পেশাব করতে শুরু করলো। ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এ মসজিদগুলো পেশাব-পায়খানার জন্য বানানো হয়নি; শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার যিকর, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য বানানো হয়েছে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৮৫)

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন একসময় আসছে, যখন মানুষ মসজিদে বসবে এবং তাদের একমাত্র চিন্তা হবে দুনিয়া; আল্লাহ তা'আলার তাদের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তাদের সাথে বসবে না। (মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৭৯১৬)

হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ রহ. বলেছেন, একদিন আমি মসজিদে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন একব্যক্তি আমার দিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, তিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.। তিনি আমাকে বললেন,

যাও, ঐ দুই ব্যক্তিকে নিয়ে এসো। তাদেরকে নিয়ে আসার পর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন অঞ্চলের? তারা উত্তরে বললো, আমরা তায়েফের অধিবাসী। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তোমরা মদীনার অধিবাসী হতে তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রহার করতাম; তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলেছো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৭০)

হযরত ওয়াসিলাহ ইবনে আসকা' রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসজিদকে তোমাদের শিশু, পাগল, বেচাকেনা, ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ-হুল্লোড় থেকে বাঁচিয়ে রাখো। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৭৫০)

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করার সময় বলেছেন, ... মানুষ মসজিদে জোরে কথা বলবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২২১০, ২২১১)

অতএব প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় (মসজিদে যখন কেউ ইবাদতরত থাকে) কারো কথা বলার প্রয়োজন হলে অবশ্যই হালকা আওয়াজে এবং অতিসংক্ষেপে বলতে হবে। বিনা প্রয়োজনে কথা বলা, দীর্ঘ সময় কথা বলা, প্রয়োজনের চেয়ে উচ্চস্বরে কথা বলা, গল্প-গুজব করা বা মোবাইলে জোরে কথা বলা যার ফলে ইবাদতে ও মুনাজাতে লিপ্ত মুসল্লীদের একাগ্রতা নষ্ট হয়, এগুলোর কোনটিই জায়েয হবে না। (সূরা বাকারা- ১১৪, ফাতাওয়া শামী ১/৬৬০, ২/৪৯৪, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩৭/২০৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/৩৫৪, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৩/৪৯৭)

হাফেয মুহাম্মাদ নূরে আলম বাবুল
বেগমপুর, কোনাবাড়ি, গাজীপুর

২৬১ প্রশ্ন : (ক) আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বেপর্দায় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন, চিকিৎসা করেন, মহিলাদের চিকিৎসার নামে তাদের সঙ্গে গল্প করেন, মিথ্যা বলেন ইত্যাদি। এলাকার অনেক মুসল্লী তার পিছনে নামায পড়তে পছন্দ করে না। এখন জানার বিষয় হলো, এই ইমামের পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

(খ) ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মসজিদে মকতব পরিচালনা করা হয়। ইমাম সাহেব আমাদের মসজিদে ঐ মকতব চালু করতে চাচ্ছেন। ব্যাংকের টাকা দিয়ে মকতব চালু করা শরীয়তসম্মত কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : (ক) প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হলে ঐ ইমাম সাহেব ফাসেক। আর ফাসেকের জন্য ইমামতি মাকরূহ ও তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। তাই উক্ত ইমামের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী হবে এবং ইমাম হিসেবে তার নিয়োগ বহাল রাখা শরীয়ত মতে বৈধ হবে না। সংশ্লিষ্ট গুনাহ ছেড়ে তওবা না করা সত্ত্বেও যে সকল লোক তাকে ইমামতি করতে সাহায্য করবে তাদের সকলেই গুনাহগার হবে। (ফাতাওয়া শামী ১/৫৬০, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/২৫১,আল-বাহরুর রায়িক ১/৬১০, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৮৮)

(খ) আমাদের জানামতে শরীয়ত মোতাবেক লেনদেনের নামে যেসব ব্যাংক আমাদের দেশে কাজ করে যাচ্ছে, সেগুলোর প্রায় সবগুলোই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুদের সঙ্গে জড়িত। তবে কোনোটা সুদী কারবারের সঙ্গে তুলনামূলক কম জড়িত, আর কোনোটা বেশি। আবার কোনো কোনোটা সম্পূর্ণ সুদভিত্তিক। সম্পূর্ণ সুদমুক্ত বিনিয়োগকারী কোন ব্যাংক বাংলাদেশে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

সুতরাং ব্যাংকের টাকা দিয়ে মকতব চালু করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। বরং মসজিদ কমিটির উচিত নিজেদের অথবা মানুষের কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে মকতব পরিচালনা করা। (সূরা আলে ইমরান- ১৩, সূরা বাকারা- ২৭৫-২৭৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১২০৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২০৬৯০, বাযলুল মাজহুদ ১০/১৪৮)

জাওয়াদ নাহিয়ান
ঢাকা

২৬২ প্রশ্ন : (ক) অমুসলিম দেশে কিংবা শুধু অমুসলিমদের সঙ্গে সুদের কারবার করা বৈধ কি না?

(খ) অমুসলিম দেশে ব্যাংকে চাকরী করা বৈধ কি না?

উত্তর : (ক) সুদ কুরআন এবং হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার আলোকে হারাম ও নাজায়েয। এর ক্ষেত্রে মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তদ্রূপ মুসলিম দেশ ও অমুসলিম দেশের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই; সকল স্থানে সমান হুকুম এবং এর উপরই ফতওয়া। কোন কোন ফুকাহায়ে কেরাম কিছু শর্তসাপেক্ষে অমুসলিম দেশে অমুসলিম ব্যক্তির সন্তুষ্টিচিত্তে সুদী লেনদেনকে যদিও জায়েয বলেছেন, কিন্তু এর উপর ফতওয়া নয়। বর্তমানে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশে তেমনিভাবে মুসলিম ও অমুসলিমের সাথে লেনদেন করা অতি সহজ এবং নিত্যদিনের বিষয়। এ অবস্থায় এ মতের উপর আমলের সুযোগ দিলে মানুষ ঘরে বসেই সুদ খাওয়া শুরু করে দিবে এবং সুদী লেনদেন আরো ব্যাপকতা লাভ করবে। অতএব মুসলিম অমুসলিম সব দেশেই সুদের লেনদেন হারাম; এ মতের উপরই ফতওয়া। (সূরা বাকারা- ২৭৫, ফাতাওয়া শামী ৫/১৮৬, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া-আদিল্লাতুহ ৫/৩৭৩৯, ফাতাওয়া উসমানী ৩/২৬৭-২৬৮)

(খ) যেমনিভাবে মুসলিম দেশে ব্যাংকে চাকরী করা বৈধ নয়, তেমনিভাবে অমুসলিম দেশেও ব্যাংকে চাকরী করা বৈধ নয়। অবশ্য কেউ চাকরীরত থাকলে এবং জীবন ধারণের অন্য কোন উপায় না থাকলে অন্য হালাল উপায় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকে চাকরী করতে পারবে। যদি অন্য কোন হালাল উপায়ের সুযোগ হয়ে যায় তখন ব্যাংকে চাকরী করতে পারবে না; বরং অন্য উপায় অবলম্বন করবে এবং অন্যান্য সুবিধা যা ভোগ করা হয়েছে হিসেব করে তার সমমূল্য সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবে। একত্রে সম্ভব না হলে সামর্থ্য অনুযায়ী ধীরে ধীরে করবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া-আদিল্লাতুহ ৫/৩৭৩৯, ৩৭৪০, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ২২/৭৪, ফাতাওয়া উসমানী ৩/২৬৯)

মুহাম্মাদ রেজাউল কারীম
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২৬৩ প্রশ্ন : আমি যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি তা অংশিদারী প্রতিষ্ঠান, যার মালিক পাঁচজন। একজন নিয়মিত নামায পড়েন; কিন্তু আহলে হাদীস। চায়না থেকে স্যানিটারী মাল আমদানী করে এবং দেশীয় স্যানিটারী মাল সংগ্রহ করে বিভিন্ন কমিশন হারে বিক্রি করে থাকে। মাল আমদানীর জন্য ব্যক্তিগত ঋণও ব্যাংক থেকে নিয়ে থাকে। আমার কাজ হলো, মালের চালান করা ও বিল করা এবং কর্মচারীদের দৈনন্দিন খরচের টাকা আদান-প্রদান করা। আমি চালান কাটার পর গ্রাহককে মাল পৌঁছানোর ক্ষেত্রে

পাইপ ৩.৪ মিলিমিটার মোট চালান কাটা হয়; কিন্তু দেয়া হয় ৩.০ মিলিমিটার, ১৫০০ ফুট পাইপ চালান কাটা হয়; কিন্তু দেয়া হয় ১০০০ ফুট অথবা চালানে লেখা থাকে ১৩০০/১৪০০ ফুট; কিন্তু কখনো তা আর দেয়া হয় না। যেমন চালানে লেখা থাকে ১৫টি, মাল দেয়া হয় ১৩টি। এভাবে ১৫টি মাল দেয়া হয়েছে মর্মে স্বাক্ষর নিয়ে আসে। ১টা মালের দাম ১৩ টাকা; কিন্তু বিল করা হয় তা থেকে বেশি টাকা।

মোটকথা, চালানে যা লেখা থাকে সে অনুযায়ী মাল দেয়া হয় না। বিল করা হয় চালান দেখে। ফলে প্রকৃতপক্ষে যে মাল দেয়া হয় তা থেকে বেশি বিল করা হয়। মালিককে ১০% বা ২০% হারে মাল দেয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৩০% বা ৪০% হারে বিল করা হয়। এই যে মাঝে অতিরিক্ত টাকা থাকে তা মিস্ত্রি বা অন্যান্যদের দেয়া হয়।

মালিকপক্ষের সবাই আমার মামা হয়। আমি আমার একমামার বাসায় পরিবার নিয়ে থাকি। তাদের প্রতি আমার পরিবারের মুখাপেক্ষিতা রয়েছে। আমার কাজ হলো, চালান করা ও বিল করা এবং অফিস দেখাশোনা করা। এজন্য আমার জন্য মাসিক ৯০০০ টাকা হারে বেতন ধার্য করা আছে। আমাকে প্রতি মাসে মোবাইল বিল বাবদ ৫০০ টাকা দেয়া হয়। এর থেকে অতিরিক্ত কোন টাকা গ্রহণ করি না। টাকা-পয়সার সমস্ত লেনদেন মালিকপক্ষ করে থাকে। হিসাব-নিকাশ মালিকপক্ষই করে থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই কাজ করার বিনিময়ে যে টাকা মাসিক বেতন হিসেবে থাকি তা হালাল না হারাম? জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : মিথ্যা বলা বা ধোঁকা দেয়া ও চুরি করা যেমন কবীরা গুনাহ, ঠিক তেমনই মিথ্যা, ধোঁকা ও চুরির কাজে সহযোগিতা করাও গুনাহের কাজ। তাই যেহেতু এই মিথ্যা ও চুরির কাজে প্রশ্নের বর্ণনা মতে আপনিও সহযোগিতা করেছেন, কাজেই এ দায়িত্ব পালন করে আপনি যে বেতন পাচ্ছেন তা হালাল হবে না। আপনার করণীয় হলো, মালিকপক্ষকে বলে বিল করা ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব পালন করার যিম্মাদারী নেয়া। অন্যথায় অন্যত্র কোন হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা। (সূরা আনকাবূত- ৩, সূরা মায়িদা- ২, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০২, আল-মাবসূত ৪/৯৬, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৬/৪৫)

মুহাম্মাদ রেজাউল কারীম
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২৬৪ প্রশ্ন : আমরা দু'জন (মুহাম্মাদ বেলাল ও মুহাম্মাদ রেজাউল কারীম) একটি অংশিদারী ব্যবসা শুরু করি। মুহাম্মাদ বেলাল তার একজন বন্ধুর নিকট থেকে দশ হাজার টাকা করযে হাসানা নিয়ে আসে। আর মুহাম্মাদ রেজাউল কারীম সাতাশ হাজার সাতশ' টাকা নিয়ে আসে যেটা (জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার দারুল ইফতা থেকে প্রদত্ত) ফতওয়া নম্বর ৪৪৭৯-এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে চাকরির বিনিময়ে। দু'জনের লাভ-লোকসান অর্ধেক অর্ধেক হারে বণ্টিত হওয়ার শর্তে। পরবর্তী সময় বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকা নেয়া হয় এবং ফেরত দেয়া হয়। সর্বশেষ দু'জনের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা করযে হাসানা নিয়ে ব্যবসা করে আসছি; যা ফেরত দেয়া হয়নি। গত বছর দোকানের ভাড়া বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা কম বেশি দেয়া হয়েছে। বর্তমানে দোকানে পঞ্চাশ হাজার টাকার কম বেশি মাল থাকতে পারে।

এখন একটি মাসআলা জানতে চাই, তা হলো, ৪৪৭৯ নম্বর ফতওয়ায় বলা হয়েছে, আমরা চাকরী করার বিনিময়ে যা বেতন পেয়ে থাকি তা হালাল হবে না। তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে থাকি বিশ হাজার টাকা; যা আমার বেতন থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে পরিশোধ করা হতো। তবে বিশ হাজার টাকার অতিরিক্ত দিতে হতো না। তাহলে যে ব্যবসা করছি তা সম্পর্কে শরীয়ত কি বলে? যদি হালাল না হয় তাহলে বর্তমান ব্যবসা হালালভাবে করার জন্য শরীয়তে কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

উত্তর : শরীয়ত অনুযায়ী প্রশ্নোক্ত ব্যবসায় আপনার অংশের পুঁজি পুরোটাই হারাম। কেননা বিশ হাজার টাকা যা আপনি ঋণ হিসেবে প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়েছেন তা মূলত অগ্রীম বেতন। অবশিষ্ট টাকাও বেতন। আর আপনার চাকরীর বিনিময়ে উপার্জিত বেতন ফতওয়া নম্বর ৪৪৭৯ অনুযায়ী হালাল নয়। তাই এ ব্যবসাকে হালাল করার জন্য আপনার অংশের মোট পুঁজি অর্থাৎ সাতাশ হাজার সাতশত টাকা সমপরিমাণ অর্থ আপনার পক্ষ হতে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবদের দান করে দিবেন। ঐ পরিমাণ অর্থ দান করে দেয়ার পর আপনার অংশের পুঁজি ও লাভ দু'টিই হালাল গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, যৌথ মূলধনী ব্যবসায় ক্ষতি বহন করতে হয় অংশিদারদের পুঁজি অনুপাতে আর লাভের অংশ চুক্তির সময়ের শর্ত অনুপাতে। পুঁজি কম বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষতির ভাগ সকলের সমান শর্ত করা হলে চুক্তি ফাসেদ হয়ে যায়। কাজেই আপনাদের চুক্তিটি সেভাবে সংশোধন করে নিবেন। আর পূর্বের হারাম কাজের উপর তওবা ইসতিগফার করে নিতে হবে। (সূরা নিসা- , সহীহ বুখারী ৩/১২১, বাযলুল মাজহুদ ১/৩৫৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৩০৪)

মুঈনুদ্দীন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

২৬৫ প্রশ্ন : এ বছর (২০১৭) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছে। আবেদনের সময় পদের পছন্দক্রমের তালিকা দিতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পছন্দক্রম অনুযায়ী চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয়। এখন জানার বিষয় হল, নিম্নলিখিত কোন পদসমূহে নিয়োগ পেলে নিজে দীনের উপর চলা যাবে এবং দেশের মানুষের সেবাও করা যাবে?

পদের তালিকা (বি.সি.এস ক্যাডার) নিম্নরূপ-

১. এডমিনিস্টেশন (সহকারী কমিশনার)
২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (সহকরী সচিব)
৩. পুলিশ (সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট)
৪. খাদ্য অধিদপ্তর (সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক)
৫. নিরীক্ষা ও হিসাব (সহকারী মহা হিসাব নিয়ন্ত্রক)
৬. অর্থনীতি (সহকারী প্রধান)
৭. আনসার (সহকারী পরিচালক)
৮. ডাক বিভাগ (সহকারী পোস্টমাস্টার)
৯. তথ্য বিভাগ (সহকারী পরিচালক)
১০. ট্যাক্স বিভাগ (সহকারী পরিচালক)
১১. রেলওয়ে বিভাগ (সহকারী ট্রাফিক সুপার)
১২. সমবায় (সহকারী নিবন্ধক)
১৩. পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ (সহকারী পরিচালক)

উত্তর : বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পদের তালিকার মধ্যে ট্যাক্স বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ব্যতীত যে কোন বিভাগে নিজের দীনদারী অক্ষত রাখার চেষ্টা এবং স্বেচ্ছায় কোন ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িত না হওয়ার নিশ্চয়তার সাথে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে চাকুরী করা শরীয়ত

মতে জায়েয হবে। ট্যাক্স বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অনেক ক্ষেত্রে চাকুরী করা ইসলামী শরীয়ত মতে নাজায়েয। (সূরা মুমিনূন- ৫১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৪২, ২৫৭৭, মু'জামুত তাবারানী আওসাত; হা.নং ৬৪৯৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/১৪৮, ১৫৭, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৭/৫০৯)

ডা. মুহাম্মাদ আবুল ফারাহ
ঢাকা

২৬৬ প্রশ্ন : কোন কোন ঔষধ কোম্পানী ঔষধের স্যাম্পল, প্যাড, কলম, ক্যালেন্ডার, তৈজসপত্র, সাবান, শ্যাম্পু, ইলেক্ট্রনিক্স জিনিসপত্র ইত্যাদি ডাক্তারদেরকে গিফট হিসেবে দিয়ে থাকে। এগুলো কি ডাক্তাররা গ্রহণ করতে পারবে?

ঔষধ কোম্পানীর সাথে কোন রকম চুক্তি ছাড়াই অথবা বিশেষ কোন কোম্পানীর ঔষধ না লিখলেও ঐ কোম্পানীর কোন গিফট কি নেয়া যাবে? বিশেষ করে বহির্বিভাগে কর্তব্যরত ডাক্তারকে অনেক কোম্পানী ঔষধ না লিখলেও গিফট দিয়ে থাকে। এগুলো কি ডাক্তাররা গ্রহণ করতে পারবে?

উল্লেখ্য, আমি যখন ২০০৪ সালে ইন্টার্নিশিপ করি তখন আমাদের বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে প্রতিটি ঔষধ কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন করার সময় সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকে যে, প্রত্যেক ডাক্তারকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঔষধ স্যাম্পল হিসেবে দিতে হবে; নইলে ডাক্তাররা ঔষধ সম্পর্কে জানবে কিভাবে? আরো শুনেছি, চুক্তিভিত্তিক লেনদেন না হলে বিনা শর্তে কোন কোম্পানী গিফট দিলে সেটা নেয়া যাবে। সে হিসেবে আমরা প্যাড, কলম ও অন্যান্য গিফট চুক্তি ছাড়াই হাসপাতালে কাজ করার সময় নিয়েছি।

তাছাড়া ডাক্তারদের সেমিনারগুলোতে বিভিন্ন জিনিসপত্র যথা : ব্যাগ, খাবার, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ইত্যাদি গিফট করে থাকে। এগুলো গ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তর : বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানীর পক্ষ থেকে ডাক্তারদেরকে যে সকল হাদিয়া-উপঢৌকন দেয়া হয় সেগুলো সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে-

(১) যে সকল জিনিস সমাজে মূল্যবান আসবাবপত্র হিসেবে গণ্য হয়।

(২) যে সকল জিনিস সমাজে মূল্যবান আসবাব হিসেবে গণ্য হয় না।

প্রথম প্রকার বস্তুর ক্ষেত্রে (কোম্পানীর লোগো, ঔষধের গুণগত মানের বিজ্ঞাপন, মান নির্ণয়কারী সংস্থার সত্যায়ন ইত্যাদির কারণে) তাতে কোম্পানীর প্রচারণার সুবিধা থাকলেও বাস্তবতার আলোকে প্রচারণার সুবিধাটি গৌণ হবে এবং উপঢৌকনের নামে ঘুষের বিষয়টি মুখ্য হওয়ায় তা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই এ জাতীয় জিনিসের আদান-প্রদান নাজায়েয হবে।

দ্বিতীয় প্রকার বস্তুর ক্ষেত্রে তাতে কোম্পানীর প্রচারণার সুবিধা থাকার সুরতে বাস্তবতার আলোকে প্রচারণার বিষয়টি মুখ্য হবে এবং উপঢৌকনের বিষয়টি গৌণ হওয়ায় তা আদান-প্রদান ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে না। কাজেই তা আদান-প্রদান বৈধ হবে।

এ মূলনীতির আলোকে মূল্যবান ঘরোয়া সামগ্রী তথা ব্যাগ, ছাতা, সাবান-শ্যাম্পু, ইলেক্ট্রনিক্স আসবাবপত্র ইত্যাদির বিনামূল্যে আদান-প্রদান যেহেতু সমাজে উপঢৌকন হিসেবে গণ্য করা হয়, কাজেই নাজায়েয ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা গ্রহণ করা ডাক্তারদের জন্য বৈধ হবে না। যদিও সেগুলোকে প্রচারণার নামে দেয়া হয়।

এর বিপরীতে স্যাম্পল হিসেবে দেয়া ঔষধপত্র, প্যাড, কলম, নোটবুক, ডায়েরি ইত্যাদি বস্তুর ক্ষেত্রে বিনামূল্যে আদান-প্রদান সাধারণত উপঢৌকন হিসেবে দেখা হয় না। কাজেই তাতে প্রচারণার সুবিধা থাকার সূরতে আদান-প্রদান জায়েয হবে। এ সকল বস্তু ডাক্তারগণ নিজেরাও ব্যবহার করতে পারবেন এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকেও হাদিয়া দিতে পারবেন। (সূরা মায়িদা- ৪২, মুসনাদে আহমাদ ৩৯/১৪, শরহুন নাবাবী আলা মুসলিম ১২/১১৪, ফাতাওয়া শামী ৫/৩৭২, আল-বাহরুর রায়িক ৬/৪৭০, বাদায়িউস সানায়ে' ৭/৯, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১১/৭৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/৫০২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/১০১)

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

পাথর ও সিলেকশন বালু

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর
এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
৪১/৯ সি হাজী আফসার উদ্দীন লেন
ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
০১৭১৬৭১০৭১১

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

তালিবুল ইলম! তোমরাই সর্বোত্তম

মাওলানা সাঈদুয্‌যামান

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৭৩৯) হাদীসটি হযরত উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীস শরীফে সর্বোত্তম মানুষের পরিচয় বলেছেন। কুরআন শরীফ শেখার দ্বারা শুধু তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখাই উদ্দেশ্য নয়; এর পাশাপাশি কুরআন শরীফের তরজমা-তাফসীর, হাদীস শরীফের অধ্যয়ন এবং সুন্নাহ মুতাবেক জীবন গড়ার জন্য ফিকহী মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা করা বা শেখানো সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলো কুরআন মাজীদেরই ব্যাখ্যা, যা গ্রহণ করতে কুরআন শরীফেই সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। এককথায় পুরো ইলমে দীন কুরআনী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। দীনী ইলম বান্দাকে তার মুনীবের সঙ্গে অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। এ বন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যেই হেরা গুহায় প্রতিধ্বনিত হয়েছিল– إقرء باسم ربك الذي خلق (অর্থ) পড়ো তোমার প্রভুর নামে। (সূরা আলাক- ১)

কুরআনে মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে, يرفع الله الذين امنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات (অর্থ) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যারা ইলম অর্জন করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বহু গুণ বাড়িয়ে দিবেন। (সূরা মুজাদালাহ- ১১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেন, (অর্থ) যারা জানে আর যারা জানে না তারা কখনো সমান হতে পারে না। (সূরা যুমার- ৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (অর্থ) যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের পথে বের হলো, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করে দেন। তিনি আরো বলেন, (অর্থ) দীনী ইলম শিক্ষাকারীর সম্মান ও সন্তুষ্টির জন্য ফেরেশতারা নূরের ডানা বিছিয়ে দেন। (সুনানে তিরমিযী ; হা.নং ২৬৮২)

কিন্তু তালিবে ইলম যদি নিজের যথাযোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি না করে কারও কানপড়া গ্রহণ করে ধোঁকা খায় তাহলে এর চেয়ে হতভাগ্য, বঞ্চনা আর হতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে, নবীজী বলেন, (অর্থ) আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল চান তাকে দীনের বুঝ দান করেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১)। বোঝা গেল, যে ব্যক্তি দীনী শিক্ষার সুযোগ পেয়েও তা হাতছাড়া করল, প্রকৃতপক্ষে সে মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল।

প্রিয় পাঠক! এটা ইলমে দীন থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। আজ যুগসচেতন বহু বাবা-মায়ের স্বপ্ন হলো তাদের কলিজার টুকরা সন্তান হাফেযে কুরআন হবে। সত্যের দিশারী আলেমে দীন হবে। খোদার রাহে নিবেদিত আল্লাহওয়ালা হবে। কিন্তু অনেক অভিভাবক এ মহৎ উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেন না। এটা যে শুধু সন্তানের একার দোষ তা নয়। অনেক সময় বাবা-মা নিজ স্বপ্ন মোতাবেক সন্তানকে গড়ার ব্যবস্থা করতে উদাসীন থাকেন। অনেকে জেনে-বুঝে পথভ্রষ্টতার পরিবেশ তৈরি করে রাখেন। এই প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে সন্তান বাবা-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয়। কখনো সমাজের একশ্রেণীর অতি কল্যাণকামী লোকেরা খোঁচা দেয়, 'ফকীরী বিদ্যা পড়ে খাবে কী করে?', 'দুনিয়ায় চলবে কীভাবে?'। এই সব অতি দরদীরা শুনে রাখুক! তালিবে ইলম বিশ্বাস করে এই পুরো দুনিয়াটা আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনিই তার সকল সৃষ্টিকে রিযিক দেন। মানুষ দুনিয়াতে আসার আগেই তার দানাপানির বণ্টন হয়ে যায়। কেউ যদি দুনিয়ার ছ'লাইন বিদ্যা শিখে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে, তাহলে তালিবুল ইলম আল্লাহর যমীনে তাঁর দীনের খেদমত করে অনাহারে থাকবে, এটা কিভাবে ভাবা যায়? দেখা গেছে, দীনের খাদেমরা গণনায় কম হলেও বরকতের রিযিক লাভ করেন এবং সেটা ইজ্জতের সাথেই লাভ করেন। বস্তুত এ পথে হেঁটে-চলে যারা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে পারে না, দীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হতে পারে না, ইলমে দীনকে সঠিকভাবে দক্ষতার সঙ্গে অর্জন করে না, তারাই মূলত হীনম্মন্য হয়ে এ-কূল ও-কূল দু'কূলই হারায়। আসল সমস্যা হল, আত্মবিস্মৃত হওয়া, নিজের মর্যাদা ভুলে যাওয়া। কবি বড় দামী কথা বলেছেন,

برخود نظر کشاز تہی دامنی مرنج

درسپہر توماہ تمامے نہادہ اند

'শূন্য আঁচল দেখে ক্ষুণ্ন কেনো বন্ধু! আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করো, তোমার হৃদয়ে তো লুকিয়ে আছে পূর্ণিমার ভুবনমোহিনী চাঁদ।'

যার হৃদয়ে খোদার কালাম আছে, যার মন-মস্তিষ্কে দীনের হাজারো মাসাইল ঘুরপাক খাচ্ছে, মুখে উচ্চারিত হচ্ছে কুরআনের আয়াত, তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা এবং যে কিনা ইখলাসের গুণে গুণান্বিত, তাকওয়া-তাহারাত ও সুন্নাতের সাজে সজ্জিত তার আবার হীনম্মন্যতা কিসের! সে তো আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি, তার প্রিয় বন্ধু। শেখ সা'দী রহ. বলেন,

محال است چوں دوست دارد ترا

کہ در دست دشمن گزارد ترا

অর্থাৎ এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা তোমায় বন্ধু বানিয়ে ফের শত্রুর করুণাপ্রার্থী বানাবেন।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. বলেন, তালিবুল ইলমের জানা উচিত, এ পথ সম্পদ উপার্জনের পথ নয়। দুনিয়ার নাম-যশ অর্জনের পথ নয়। এটা খোদার রাহে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার পথ। নিঃসন্দেহে এটা অল্পেতুষ্টির, কষ্ট ও মুজাহাদার, সুউচ্চ হিম্মতের এবং দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত সওদা করার পথ। (পা-জা সুরাগে যিন্দেগী)

প্রিয় পাঠক! উপর্যুক্ত হীনমম্মন্যতার আরেকটি কারণ হল, ইলমের নিমগ্নতা না থাকা। ইলম অর্জনের জন্য একাগ্রতা, নিমগ্নতা এবং দুনিয়াবিমুখতার বিকল্প নেই। বস্তুত এ নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও সাধনা দুনিয়াবী ও পরকালীন সকল জ্ঞান অর্জনের জন্যই শর্ত। ইলমে দীনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব তো বলার অপেক্ষা রাখে না। ঠাণ্ডা-গরম, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, সুখ-দুঃখ কোন কিছুই ইলমপিপাসুর তৃষ্ণায় বাধ সাধতে পারে না। আরবী ভাষাবিদ ইমাম ইবনে ফারিস রহ. বলেন,

إذا كان يؤذيك حر المصيف
وييس الخريف وبرد الشتا
ويلهيك حسن زمان الربيع
فأخذك للعلم قل لي متى

অর্থাৎ যদি গ্রীষ্মের উষ্ণতা, বর্ষার আর্দ্রতা আর শীতের ঠাণ্ডা তোমায় পেরেশান করে, যদি বসন্তের সৌন্দর্য-সম্ভার তোমায় বিমোহিত করে তাহলে তোমার ইলম অর্জন কখন হবে বলো?

ইতিহাসের দোহাই, যে তালিবে ইলম ইলম অর্জনে কষ্ট সয়েছে, দুনিয়ার লোভনীয় হাতছানি উপেক্ষা করেছে, ইলমের দক্ষতা, বিস্তৃতি ও গভীরতাই যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যমানা তাকে খোদায়ী নির্দেশে মানবমনে রাজত্বের আসনে বসিয়েছে। মানুষ তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর মুহাব্বতে ভাসিয়েছে। আল্লাহর হুকুমে দুনিয়া তার পায়ে এসে লুটিয়েছে। কবি বলেন,

منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی
اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے

গন্তব্যের অন্বেষায় তুমি দিশেহারা হে পথিক! নিজকে গড়ে নাও এমন যেন গন্তব্য তোমায় দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে।

দু'জন মনীষীর শিক্ষা জীবন ও পরবর্তী অবস্থা লক্ষ্য করুন।

এক. হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ.। একাধারে ত্রিশ বছর দারিদ্র্য, অভাব-অনটন সহ্য করে বাইতুল্লাহর পাশে অবস্থান করেছিলেন শুধু এবং শুধুমাত্র কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জনের জন্য। পার্থিব কোন প্রয়োজন তাকে এ সাধনা থেকে ফেরাতে পারেনি। তিনি হযরত আয়েশা, আবু হুরাইরা, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ বিখ্যাত ও বিশিষ্ট সাহাবীদের কাছ হাদীস শরীফের সবক নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার এ কুরবানী ও ত্যাগ এত পছন্দ করেছেন যে, খোদ সাহাবায়ে কেরামও তার ইলমের প্রশংসা করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে একবার কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলে উঠলেন, 'হে মক্কাবাসী! তোমাদের কাছে আতা ইবনে আবী রাবাহ থাকতে আমায় কেন জিজ্ঞেস করছ হে'!!। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, আমি আতা ইবনে আবী রাবাহের চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি। বনু উমাইয়ার খেলাফতকালে হজ্জের সময় খলীফার পক্ষ থেকে ঘোষণা হতো –'মানুষের জিজ্ঞাসাবলীর উত্তর (ফাতাওয়া) কেবল আতা ইবনে আবী রাবাহ-ই দিবেন।' বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ সম্মান শুধু তার ইলমী দক্ষতার কারণেই হয়েছে। নতুবা তার মধ্যে বাহ্যিক সৌন্দর্য বলতে কোন কিছু ছিল না। তার পিতা ছিলেন আযাদকৃত গোলাম। আর তিনি কালো, বোঁচা নাকবিশিষ্ট ও প্রতিবন্ধী ছিলেন। (সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা ৫/৭৮)

দুই. প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ ইমাম আবু সাঈদ আব্দুল মালিক ইবনে ক্বারীব আল আসমায়ী রহ.। তিনি ইবনে আউন, মিস'আর ইবনে কিদাম প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে হাদীসের দরস গ্রহণ করেছেন। তার সম্পর্কে কাযী আবু আলী আত তান্নুখী الفرج بعد الشدة (দুঃখের পর সুখ) নামক কিতাবে লিখেছেন, ইমাম আসমায়ী বলেন, আমি বসরায় শিক্ষারত ছিলাম। অভাব-অনটন ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। আমার ছোট্ট কামরাটি যে গলিতে ছিল তার মুখে এক মুদি দোকানদার থাকতো। সকাল-সন্ধ্যা দরসে যাতায়াতের সময় তার সঙ্গে আমার দেখা হতো। সে বলতো, কোথায় যাচ্ছো হে? আমি বলতাম, অমুক হাদীস বিশারদের কাছে। রাতে ফেরার সময় সে বলতো, কোত্থেকে? বলতাম, অমুক ইতিহাসবিদের কাছ থেকে। কিন্তু প্রায়ই সে বলতো, দেখো! আমার উপদেশ মানো, এমন কাজ করো যার দ্বারা তোমার দু-চার টাকা উপার্জন হবে। একদিন সে ইলমের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলল, তোমার সবগুলো কিতাব আমায় দিয়ে দাও, আমি মদের মটকায় ভিজিয়ে দেখি কোন ফল পাই কিনা! খোদার কসম! তুমি যদি সবগুলো কিতাবের বিনিময়ে আমার কাছে এক আটি সবজিও চাও, আমি তা-ও দেব না তোমাকে। ইমাম আসমায়ী বলেন, তার কথায় আমি খুব ব্যথিত হলাম। এর পর থেকে খুব ভোরে বের হতাম আর মধ্যরাতে বাসায় ফিরতাম যেন ঐ দোকানীর সঙ্গে দেখা না হয় এবং তার ফালতু কথাও শুনতে না হয়। এতে আমার জীবন আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। আমি ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি করতে আরম্ভ করি। একসময় এতোটাই অসচ্ছল হয়ে পড়ি যে, চুল কাটানোর টাকার যোগাড় করাও আমার সাধ্যে ছিল না। হঠাৎ একদিন তৎকালীন বসরার আমীর মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান আল-হাশেমীর নওকর এসে আমাকে বলল, বসরার আমীর আপনাকে স্মরণ করেছেন। আমি বললাম, আমার মত ডাল-রুটিহীন ব্যক্তির সঙ্গে আমীরের আবার কী কাজ?। আমার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে গিয়ে সে আমীরকে অবহিত করে এবং পরদিন একটি দামী বাক্সে আমার জন্য সুগন্ধিযুক্ত কাপড় আর একটি থলের মধ্যে এক হাজার দিরহাম নিয়ে আসে। আমি গোসল করে পরিপাটি হয়ে আমীরের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আমীরুল মুমিনীনের সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য নির্বাচন করেছি। অতএব প্রস্তুত হও, শীঘ্রই তোমাকে বাগদাদে যেতে হবে। যা হোক, ইমাম আসমায়ী রহ. খলীফা মামুনুর রশীদের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তার পুত্র মুহাম্মদের তালিম তরবিয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দশ হাজার দেরহাম তার মাসিক বেতন ধার্য হলো। আর শাহী মেহমানদারী তো আছেই। তিনি বলেন, সেখানে আমি যতদিন ছিলাম ততদিনে সে কুরআন শরীফ শিখলো, দীনী বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করলো, আরবী ভাষা, কবিতা-ইতিহাস ইত্যাদি রপ্ত করলো। একদিন বাদশাহর আদেশে সে জুমু'আর নামায পড়ালো। তার খুতবায় মুগ্ধ হয়ে শিক্ষক হিসেবে চারিদিক থেকে আমার নামে শুভাকাঙ্ক্ষীদের হাদিয়া আসতে থাকলো। এতদিনে ইমাম আসমায়ী বসরায় বেশ অর্থ-সম্পদ করেছিলেন। পুত্রের শিক্ষাসমাপনে খলীফা যখন তাকে বিদায় দিলেন তখন আরো বহু উপহার উপঢৌকন প্রদান করলেন। আর মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান আল-হাশেমীকে নির্দেশ দিলেন, ইমাম আসমায়ী বসরায় পৌঁছলে তাকে যেন অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং তিন দিন পর্যন্ত তার সম্মানে বসরার জনগণ যেন শ্রেণীভেদে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। প্রথম দিন সম্ভ্রান্ত ও ধনীরা, দ্বিতীয় দিন মধ্যবিত্তরা আর তৃতীয় দিন সাধারণ লোকেরা। খলীফার হুকুম বলে কথা! তেমনটিই করা হলো। একেএকে তিন দিনে সবাই এসে খলীফার পুত্রের শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে দু'আ নিয়ে গেলো। তৃতীয় দিন সাক্ষাৎকালে একব্যক্তিকে দেখে ইমাম আসমায়ীর পরিচিত মনে হলো। যেন সেই মুদি দোকানী। ময়লা পাগড়ি, ছোট্ট জুব্বা, পায়জামাবিহীন লম্বা জামা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আব্দুল মালিক! কেমন আছো? একথা শোনামাত্রই ইমাম আসমায়ীর সেই কথাটি মনে পড়ে গেলো, যা একদিন এই দোকানী তাকে বলেছিল– 'আমি মদের মটকায় ভিজিয়ে দেখি কোন ফল পাই কিনা?'। খোদার কসম!

(৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাইতুল্লাহর মুসাফির

আহ কি প্রশান্তি! দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। দৃষ্টি যেন সরতে চায় না। এটা আমার মাওলার ঘর। কা'বার চারপাশে পাগলের মত দৌড়াতে থাকি। গিলাফ ধরে বার কয়েক চুম্বনও করি। প্রতিটি চুম্বনে কলবের জাহানে ইশক ও মহব্বতের কি আশ্চর্য ঢেউ জাগে! হৃদয় জগতে প্রেম ভালোবাসার কি অপূর্ব তরঙ্গ-দোলার সৃষ্টি হয়! এ আমার প্রভুর ঘর। কি মধুর অনুভূতি। যতই দেখি তৃপ্তি যেন মেটে না। ভাবতেই পারছি না, আমি বাইতুল্লাহর সামনে! স্বপ্ন কি তাহলে পূরণ হলো! কিন্তু বাস্তবতা যে বড়ই কঠিন। হঠাৎ আমায় নিরাশার জালে ফেলে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু আমি যে বাইতুল্লাহ ছেড়ে আসতে চাই না! চোখ বন্ধ করে পুনরায় ফিরে যাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাই। এ কি! এসব তাহলে স্বপ্নই ছিল? আমার কি তাহলে স্বপ্নেই যিয়ারত নসীব হলো! এই স্বপ্ন বাস্তবতা হয়ে কি ধরা দেবে না! তবে এমন মধুময় স্বপ্নের মূল্যই বা কম কিসে! এ স্বপ্নের স্নিগ্ধ পরশে ছিল সুখের অনুভূতি ও আনন্দের শিহরণ। কিন্তু স্বপ্নের যে ব্যথা ও বেদনা আছে, স্বপ্নের যে ব্যাকুলতা আছে, স্বপ্ন যে হৃদয়ে কান্নার ঢেউ তুলে এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরায় তা কখনো বুঝতে পারিনি। আবেগে, আনন্দে ভাবের তরঙ্গে চোখ দু'টো ছলছল করে উঠল।

দু' রাকাআত নামায পড়ে দু'হাত প্রসারিত করে আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে বললাম, প্রভু হে! কবে আসবে আমার ডাক! স্বপ্নে নয়; সশরীরে হাজির হতে চাই তোমার ঘরে। আসবে কি ডাক! দু'চোখে অশ্রুর জোয়ার এলো, বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে ভেসে গেল সব পঙ্কিলতা। হৃদয় হলো প্রশান্ত।

ইবনে মাকসূদ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

শখের জুব্বা

পবিত্র মক্কা নগরীতে হাজী সাহেবান বাইতুল্লাহর যিয়ারতে ব্যস্ত। আল্লাহর তাওফীকে আমার মেজো ভাইও ছিলেন এ বছর হাজীদের তালিকায়। কয়েকদিন হলো পবিত্র হজ্জ শুরু হয়েছে। ভাইয়া একদিন বাসায় ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদ! তোমার কি কিছু লাগবে? বললাম, আমার জন্য একটি জুব্বা আর একটি কুরআন শরীফ আনবেন। ভাইয়া বললো, ঠিক আছে, আনবো ইনশাআল্লাহ। তারপর আমি মাদরাসায় চলে আসলাম।

হজ্জ সমাপ্ত হলো। হাজী সাহেবান সবাই দেশে ফিরতে শুরু করলো। একদিন আমার ভাইয়াও দেশে ফিরে এলেন। আমি ছিলাম মাদরাসায়। একদিন আগেই আব্বু আমাকে বলেছিলেন যে, ভাইয়া এলে আমাকে বাসায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু আমি বাসায় যাবো কি, ভাইয়া নিজেই আমার কাছে চলে এলেন। আমাকে মদীনার খেজুর, একটি মিসওয়াক, চকলেট আর যমযমের পানি দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জুব্বা আনেননি? বললেন, হ্যাঁ এনেছি; বাসায় আছে।

শুক্রবার বাসায় গেলাম। আম্মুর কাছে জুব্বা চাইলাম। আম্মু জুব্বাটি এনে আমাকে বললেন, পরে দেখো তো। কিন্তু এ কি, এটা তো আমার শরীরের তুলনায় অনেক ছোট! জুব্বার হাতা আমার কনুই পর্যন্ত, আর লম্বায় তো টাখনু থেকে আট/দশ আঙ্গুল উপরে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আব্বু বললেন, সমস্যা নেই, আমি তোমাকে নতুন একটি জুব্বা বানিয়ে দিবো।

কয়েক সপ্তাহ পর মাদরাসা ছুটি হলো। বাসায় আসলাম। আব্বু বললেন, চলো, তোমার জন্য জুব্বার কাপড় কিনতে যাই। আমি তো বেজায় খুশি। আমি আর আব্বু দু'জন মিলে গেলাম সুপার মার্কেটে। কাপড় কিনতে কয়েকটি দোকান ঘোরার পর 'নিউ জামেয়া' দোকানের একটি কাপড় পছন্দ হলো। কাপড়ের দর-দাম ঠিক করছিলাম। এমন সময় দোকানে উপস্থিত হলেন হযরত মুমিনপুরী হুযূর দা.বা.। আমাকে দেখেই বললেন, কী! জুব্বা বানাবে? বললাম, জ্বী হুযূর। তিনি বললেন, আচ্ছা!... এরপর হুযূর পাঞ্জাবীর মাপ দিতে লাগলেন। আমরা কাপড়ের টাকা পরিশোধ করে হুযূরকে সালাম দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আলী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

এমন যদি হতে পারতাম!

দীর্ঘদিন একজন মানুষের নাম প্রশংসার সাথে কানে বাজে। যাকে দেখামাত্রই দর্শকপ্রাণে অনাবিল মুগ্ধতা ছুঁয়ে যায়। যার সান্নিধ্যে প্রতিটি হৃদয় শীতল পরশ অনুভব করে। যার আচরণ ও উচ্চারণে সবাই মুগ্ধ। যার মজলিসে আগমন করে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব স্থানে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। তিনি আমাদের মাদরাসার সম্মানিত পরিচালক হযরত মাওলানা নাসীরুল্লাহ সাহেব দা.বা.। তিনি শুধু সতিঘাটা মাদরাসারই পরিচালক নন; তার সুদক্ষ পরিচালনায় বর্তমানে বারো তেরোটি মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও তিনি কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটির সুযোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং শত শত এতীম, মিসকীন, অভাবী ও দুঃস্থ মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এছাড়াও তার বিশেষ পরিচালনায় যশোরের গাজীর দরগায় পরিচালিত হচ্ছে একটি সুবিশাল এতীমখানা। সেখানে প্রায় এক হাজারের মত এতীম-গরীব সত্যিকার মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছে। এছাড়াও যশোরের অন্যতম সংগঠন 'যশোর ইমাম পরিষদ' তার কৃতিত্বেই সমস্ত বাংলাদেশের ইমাম পরিষদের জন্য মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও যশোরের বিভিন্ন মাদরাসার মুহতামিম ও পরিচালকগণ কোন পেরেশানী-মুসিবতের শিকার হলে তিনি তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন এবং সুকৌশলে তাদেরকে বের করে আনেন সমস্যাবলী থেকে। শুধু তাই নয়; রাজনীতির মরণচাকায় চরমভাবে পিষ্ঠ একজন রাজনীতিবিদও সর্বহারা হয়ে আশ্রয় পান নাসীরুল্লাহ সাহেব হুযূরের কাছে। একজন দরিদ্র, একজন এতীম, একজন ঋণগ্রস্ত, এমনকি একজন প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিও মামলা-মোকদ্দমার চোরাচালে পিষ্ট হয়ে পরম ছায়ারূপে হযরতকে গ্রহণ করেন।

মোটকথা, সমাজের উচ্চশ্রেণী থেকে শুরু করে নিম্নশ্রেণী সব মানুষের দুঃখ পেরেশানীর অশ্রু পরম মমতায় কোমল হাতে মুছে দিচ্ছেন এই মহানুভব মানুষটি। আশ্চর্যের কথা হলো, সকলের আশ্রয়স্থল এই মুকুটহীন বাদশাহ নিজের জন্য এখনও কোন আশ্রয়স্থল তৈরি করেননি। ক্রয় করেননি নিজ মালিকানায় একখণ্ড জমি। তিনি চান শুধু জান্নাতের বাড়ি। জান্নাতের একখণ্ড জমি। যখনই হযরতের কথা মনে হয় চলতে ফিরতে অথবা চিন্তার জগতে, তখনই মনে হয় আহা, আমিও যদি হুযূরের মত হতে পারতাম!

আল্লাহ তা'আলা হুযূরের ছায়াকে আমাদের ওপর আরও দীর্ঘায়িত করুন এবং আমাদেরকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ উমর ফারূক
আশরাফুল মাদারিস, সতিঘাটা, পান্তাপাড়া, যশোর

দিশা দাও প্রভু!

অশান্তির উত্থান। দিকে দিকে হিংস্রতার তাণ্ডব। পৈশাচিক উল্লাসে বিপর্যস্ত মানবতা। মানবতার বীভৎস লাশ নাফ নদের তীরে।

উত্তাল তরঙ্গও স্থবির। অন্তহীন লাশের সারণি। কুকুরের টানা-হেঁচড়ায় ছিন্নভিন্ন মানবতা। বিশ্ববিবেক শান্তির ঘুমে বিভোর। ওম্‌শান্তির নিগূঢ় রহস্য আজ সুস্পষ্ট। 'জীব হত্যা মহাপাপ' স্লোগানের ভণ্ডামি আজ দৃশ্যমান। হিন্দু-বৌদ্ধের অগাধ ভালোবাসা আজ অনুমিত। তবুও মুসলিমবিশ্ব প্রমাদগ্রস্ত।

আইলানদের মিছিল আজ বিশ্বময়। নাফের কাদায় কাদায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বোনের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তবুও আমরা জাতীয়তাবাদে মোহগ্রস্ত। ভ্রাতৃত্ববোধ হৃদয়ে নাড়া দেয় না। অথচ দয়াময় প্রভু পরম যত্নে সুনিবিড়ভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আমাদের। পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠ বাণীতে ভ্রাতৃত্বের কোমল ছোঁয়ার মরমী ধ্বনি অনুরণিত– 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই' (সূরা আলে ইমরান- ১০৩)। পরম প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীতে গ্রোথিত বন্ধনের সুদৃঢ় প্রাচীর– 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' (সূরা হুজুরাত- ১৯)।

রাসূলে আরাবীর অমীয় বাণীতে ফুটে উঠেছে ভ্রাতৃত্বের রূপরেখা– 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই।' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৬৩)। আর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় অনুমিত স্বপ্নীল জীবনের সেতুবন্ধ– 'সকল মুসলিম একটি দেহের ন্যায়। যার চোখে ব্যথা হলে সারা দেহে কষ্ট অনুভব হয়। আবার মাথায় ব্যথা হলেও সর্বাঙ্গে কষ্ট অনুভব হয়।' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৮৬)।

এত সুন্দর আবেগময় মায়াভরা নির্দেশনাতেও আমাদের ঘুমঘোর কাটে না। বিবেক জাগে না। সুগম ও সাবলীল পথ দেখেও আমাদের নেই কোন ভাবান্তর। লিংকনকেই মুক্তির দিশারী ভেবে বসে আছি। তন্ত্রই আমাদের শেষ অবলম্বন ও পদক্ষেপ; দরদী নবীর সীরাত পরিত্যক্ত। আহ! আমাদের বোধোদয় আর কবে হবে? হে প্রভু! দিশা দাও। দাও হৃদয় প্রশান্তকর বোধ। যেন ফিরে পাই তোমার পথ, হতে পারি তোমার। আমীন।

কাওসার আহমাদ
জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ মাদরাসা, তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

অজানা তৃপ্তির ছোঁয়া

সকাল থেকেই লক্ষ্য করছি প্রাণপ্রিয় উস্তাদ মুফতী মাহমূদুল হাসান দা.বা.-এর মনটা একটু বেশি উৎফুল্ল। চলাফেরা বেশভূষায় একটা আনন্দ আনন্দ ছাপ দৃশ্যমান। ঠোঁটের কোণায় অজানা তৃপ্তির অমলিন হাসি। যেন মুসাফির তার গন্তব্যে পৌঁছে গেছে কিংবা জাওহরী ফিরে পেয়েছে হারানো রত্নসম্ভার। জিজ্ঞেস করবো করবো করেও করা হলো না। যথারীতি সময় মতো দরসে বসে গেলাম। দেখতে দেখতে উস্তাদজীও দরসে আসলেন। পনের মিনিট বাকি থাকতেই সবক শেষ করে দিলেন। নাহ! এতো আগে তো কখনো সবক শেষ করেন না! আজ যেন একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। মনের ভেতর কৌতূহল বেড়েই চলছে। তবে কি তিনি আমাদেরকেও তার আনন্দে শামিল করতে চাচ্ছেন? কই! একেবারে যে চুপচাপ বসে আছেন!

একটু নড়েচড়ে বসলেন। তার মানে এখনই শুরু করবেন। তিনি আমাদেরকে আবূ মুসলিম খাওলানীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া এক আশ্চর্য ঘটনা শোনালেন। আবূ মুসলিম খাওলানী মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার আসওয়াদ আনাসীকে অস্বীকারের অপরাধে(?) জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও মজবুত ঈমান তার জন্য জ্বলন্ত অঙ্গারকে শান্তির বাগান বানিয়ে দেয়। প্রেমের পরশে এ যেন দ্বিতীয় ইবরাহীম।

তিনি বলেন, একবার এক উস্তাদের মুখে ঘটনাটি শুনেছিলাম, কিন্তু কিতাবে পাইনি; গতকাল অযাচিতভাবেই মুতালা'আ করতে করতে পেয়ে গেলাম। এ যেন সুদীর্ঘ তলবের এক বহিঃপ্রকাশ। উস্তাদজীর অভিনব প্রকাশভঙ্গি এবং গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আকুলতায় আমরাও তৃপ্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এলো-

اين ابناء الملوك من هذه اللذة؟

আহ! এটাই তো ইলমের স্বাদ। আর এর লোভেই তো ইমাম গালিব কাত্তান রহ. মাত্র একটি হাদীসের জন্য এক বছর পর্যন্ত প্রতীক্ষা করেছিলেন। শাফেয়ী মাযহাবের অবিসংবাদিত ইমাম কাফ্‌ফাল শাশী রহ. চল্লিশ বছর বয়সেই ইলম অর্জন শুরু করেছিলেন। বর্ণিত আছে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহ. বলতেন,

نحن فى لذة لو علمتموها ايها الملوك لقاتلتمونا بالسيوف.

হে দুনিয়ার বাদশাহরা! আমরা যে স্বাদের মধ্যে রয়েছি যদি তোমরা জানতে তাহলে তা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে তরবারীর যুদ্ধে লিপ্ত হতে। এই ইলমের স্বাদেই পাগল হয়ে ইমাম শরীফুদ্দীন তিলিমসানী রহ. তার উস্তাদকে যা বলেছিলেন, আমাদের যামানার তালিবুল ইলম ভাইদের কল্পনায়ও তা আসে না। তার ভাষায়- لو قلت لا لقلت لا لذة فيها যদি আপনি বলতেন বেহেশতে লেখাপড়া নেই, আমি বলতাম তাহলে তো ওখানে কোন মজাই নেই।

আল্লাহু আকবার! আমাদের অনুসৃত ব্যক্তিরা কোথায় আর আমরা কোথায়! এই সকল বরিত ইমামদের রূপকথা সদৃশ জীবনী অবগত হওয়ার পরও আমাদের মনে সামান্যতম অনুভূতি সৃষ্টি হয় না। আমাদের অন্তরে নাড়াও দেয় না। হায়! কবে যে আমাদের চৈতন্য হবে!

মুহাম্মাদ সালমান হুসাইন
আশরাফুল মাদারিস, সতিঘাটা, পাল্তাপাড়া, যশোর

মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা

নিঝুম রাত। আকাশে তারার মেলা। নবমী চাঁদের স্নিগ্ধ আলো। মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়া। পুরো শহরে সুনসান নীরবতা। হেঁটে চলছি হাইওয়ের ফুটপাত ধরে। করুণ একটা কান্নাধ্বনি কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। আবারো ধ্বনিত হলো কান্নার আওয়াজ। এবার আরেকটু জোরে। উৎসস্থল আবিষ্কার করলাম। রাস্তাঘেঁষা দোকানের বারান্দায় সাত-আট বছর বয়সী একটি ছেলে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে। হাঁটা-চলার শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে তার। ধরে ধরে শহরের একটি পুরনো হোটেলে নিয়ে গেলাম। সাধ্য অনুযায়ী পেট পুরে খাওয়ালাম। এরপর সে যা জানালো, তা বর্ণনাতীত। দু'দিন যাবত তার পেটে দানাপানির ছিটেও পড়েনি। সে হাত পেতেছে শহরের বড় বড় ব্যক্তিদের কাছেও। নিরাশ হয়ে হয়ে অবশেষে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। তার কথাগুলোয় বুদ্ধিমত্তা ও মেধার ছাপ ছিলো স্পষ্ট। তার জন্যে আমার বেশি কিছু করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার কিছু কথা এবং ব্যথা আমাকে ভীষণভাবে পীড়া দিতে থাকে। ভাবনার সাগরে হারিয়ে যাই। হায়! এই কি আমাদের উন্নতি, এই কি আমাদের অগ্রগতি! সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আমরা কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে দেই, আর একটা শিশুর জীবনপ্রদীপ নিভে যাচ্ছে ক্ষুধার তাড়নায়। হায়! আমাদের কর্ণধাররা যদি একটু সদয় হতেন, এদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি দিতেন তাহলে এদের থেকেই সৃষ্টি হতো কতো বড় বড় ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে তাদের উপরও বর্ষিত হতো রহমতের অঝোর ধারা। নবীজী বলেছেন, রহমকারীদের প্রতি রহমান রহম করেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপর রহম করো আসমানবাসীরাও তোমাদের উপর রহম করবেন। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯২৪)। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য, আমরা শুধু মানবাধিকারের স্লোগানে আকাশ বাতাস ভারী করি, যদিও আমাদের মধ্যে মানবিকতার লেশমাত্র নেই।

মু'আয আল জুহানী
দারুল উলুম দেওবন্দ, ইউ.পি., ইন্ডিয়া